# স্বস্তিকা

দাম : দশ টাকা

৬৬ বর্ষ, ৩০ সংখ্যা ।। ৭ এপ্রিল - ২০১৪ ।। ২৩ চৈত্র - ১৪২০ ।। website : www.eswastika.com

## বাংলাদেশী অনুপ্রবেশ এক জাতীয় সঙ্কট

## উত্তরবঙ্গে বিজেপির প্রার্থীরা

**নিমু ভৌমিক**
রায়গঞ্জ কেন্দ্র

**বীরেন্দ্র বারা ওড়াও**
আলিপুরদুয়ার কেন্দ্র

**সত্যলাল সরকার**
জলপাইগুড়ি কেন্দ্র

**হেমচন্দ্র বর্মন**
কোচবিহার কেন্দ্র

## বিজেপির নজরকাড়া প্রার্থী

## হুগলী কেন্দ্রে চন্দন মিত্র

# সূচীপত্র

সম্পাদকীয় □ ৫
'নোটা' বোতাম টেপার অর্থ সংসদীয় গণতন্ত্রের প্রতি অনাস্থা প্রকাশ □ গূঢ়পুরুষ □ ১০
খোলা চিঠি : লক্ষ্মণের বনবাসে জেলের ভয় বুদ্ধদেবের□ সুন্দর মৌলিক □ ১১
টিপু সুলতান মসজিদের শাহী ইমাম এখন মমতার প্রধান পরামর্শদাতা □ এন সি দে □ ১২
দেশ কি আই এস আই-এর খপ্পরে? □ কল্যাণ ভঞ্জচৌধুরী □ ১৪
বাংলাদেশী অনুপ্রবেশ ও পশ্চিমবঙ্গের রাজনৈতিক ও সামাজিক সঙ্কট □ বিমল প্রামাণিক □ ১৫
নরেন্দ্র মোদীকেই প্রধানমন্ত্রী হিসাবে দেখতে চাই □ ভূপেশ দাস □ ১৯
চৈতি উৎসব রামকথা □ নবকুমার ভট্টাচার্য □ ২০
মন্দিরময় অযোধ্যা □ ড: প্রণব রায় □ ২২
মুসলিম রাষ্ট্রগুলিতে পরিবর্তনের হাওয়ায় মোল্লা-মৌলবীরা হয়রান ও বিরক্ত □ ২৯
আজকের ডগল্যাস - কেজরিওয়াল □ শ্যামলকুমার হাতি □ ৩১
উন্নয়নের নামে যে ভোগবাদ চলছে তা ব্রহ্মশক্তিহীন ক্ষাত্রশক্তির বিকাশ □ অমলেশ মিশ্র □ ৩২
ভোট-কথা □ ৩৫

## প্রচ্ছদ নিবন্ধ

স্বস্তিকা
দাম : দশ টাকা
৬৬ বর্ষ, ৩০ সংখ্যা।। ৭ এপ্রিল - ২০১৪।। ২৩ চৈত্র - ১৪২০।। website : www.eswastika.com
বাংলাদেশী অনুপ্রবেশ এক জাতীয় সঙ্কট
উত্তরবঙ্গে বিজেপির প্রার্থীরা
নিমু ভৌমিক রায়গঞ্জ কেন্দ্র
বীরেন্দ্র বারা ওড়াও আলিপুরদুয়ার কেন্দ্র
সত্যলাল সরকার জলপাইগুড়ি কেন্দ্র
হেমচন্দ্র বর্মন কোচবিহার কেন্দ্র
বিজেপির নজরকাড়া প্রার্থী
হুগলী কেন্দ্রে চন্দন মিত্র

**পৃঃ ১৪-১৮**

## নিয়মিত বিভাগ

নবাঙ্কুর : ২৪-২৫ □ □ অঙ্গনা : ২৭-২৮ □
অন্যরকম : ৩৩ □ □

সম্পাদক : বিজয় আঢ্য
সহ সম্পাদক : নবকুমার ভট্টাচার্য
প্রচ্ছদ ও রূপায়ণ : অজিত কুমার ভকত

৬৬ বর্ষ ৩০ সংখ্যা, ২৩ চৈত্র, ১৪২০ বঙ্গাব্দ
যুগাব্দ - ৫১১৫, ৭ এপ্রিল - ২০১৪

দাম : ১০ টাকা
বার্ষিক গ্রাহক মূল্য ৪০০ টাকা।

স্বস্তিক প্রকাশন ট্রাস্টের পক্ষে রণেন্দ্রলাল বন্দ্যোপাধ্যায় কর্তৃক ২৭/১-বি, বিধান সরণি, কলকাতা - ৬ হতে প্রকাশিত এবং সেবা মুদ্রণ, ৪৩, কৈলাস বোস স্ট্রীট, কলকাতা- ৬ হতে মুদ্রিত।

দূরভাষ : সম্পাদকীয় : ৯৮৭৪০৮০৩৪৩
সার্কুলেশন : ৭২৭৮৪১৭৩১৬
৮৬৯৭৫২১৪৭৯
অফিস : ৯৮৭৪০৮০৩৫৪,
৯৮৭৪০৮০৩৪১
বিজ্ঞাপন : ৯৮৭৪০৮০৩৪২

**Postal Registration No.-**
Kol.RMS/48/2013-2015

R N I No. 5257/57
দূরভাষ : ২২৪১-০৬০৩ / ৫৯১৫
টেলিফ্যাক্স : (০৩৩) ২২৪১-৫৯১৫
E-mail : swastika5915@gmail.com
vijoy.adya@gmail.com
Website : www.eswastika.com

প্রকাশিত হবে
১৪ই এপ্রিল
২০১৪

# স্বস্তিকা

প্রকাশিত হবে
১৪ই এপ্রিল
২০১৪

## নববর্ষ সংখ্যা, ১৪২১

## শক্ত ভারত, সমৃদ্ধ ভারত

২০১৪ পরিবর্তনের বছর। কেন্দ্রে সরকার পরিবর্তনের বছর। স্থায়ী কর্মক্ষম উন্নয়নে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ সরকার গঠনের বছর। যে সরকার জাতিকে উপহার দিতে পারবে এক শক্ত ও সমৃদ্ধ ভারত। সেই ভারত গঠনে বিভিন্ন ক্ষেত্রের রূপরেখা কি হতে পারে তারই উপর আলোকপাত করেছেন মেঃ জেঃ কে কে গাঙ্গুলি, নবকুমার আদক, রবীন্দ্রনাথ পতি, সব্যসাচী বাগচী, অমিতাভ ঘোষ, তথাগত রায়, প্রণব চট্টোপাধ্যায়, রণজিৎ রায় প্রমুখ।

সংরক্ষণযোগ এই সংখ্যাটির জন্য এখনই কপি বুক করুন। দাম একই থাকছে— ১০ টাকা।

HB®
INDIA'S NO. 1 IN
ISI MARKED
HEAVY PIPE FITTINGS

HB® AN ISO 9002 CERTIFIED CO.

Authorised Distributor
NATIONAL PIPE & SANITARY STORES
54, N. S. Road
Kolkata-700001
Ph : 2210-5831/5833
3, Jadu Nath Dey Road,
Kolkata-12, Ph. 2215-6804,
Fax : 2212-2803
Sister Concern
Partha Sarathi Ceramics
4, College Street,
Kolkata-700012
Ph: 2241 6413 / 5986
Fax : 033-22256803
e-mail : nps@vsnl.net
website ;
www\nationalpipes.com

সানরাইজ®
সর্ষে পাউডার

No preservatives or artificial colours used
SUNRISE®
Mustard Powder
IMPORTANT
NET WT. 50g

SUNRISE® PURE

স্বাস্থ্য-সম্মত, ঝাঁঝালো - খেতে বড্ড ভালো।

# সম্পাদকীয়

## ভেদাভেদের রাজনীতি

যে দল ভেদাভেদের রাজনীতি করিয়া থাকে তাহারা দেশের উন্নয়ন করিবে কি করিয়া? চলতি নির্বাচনী মরশুমে অসমে নিজের প্রথম জনসভায় বিজেপি-র বিরুদ্ধে এমন অভিযোগ করিয়াছেন প্রধানমন্ত্রী মনমোহন সিং। কথাটি সর্বাংশে সত্য। কারণ মানুষ দেখিয়াছে, ভেদাভেদের রাজনীতি করিয়াই কংগ্রেস দেশের সর্বনাশ করিয়াছে। সাম্প্রতিক উদাহরণ, অন্ধ্রপ্রদেশকে ভাগ করিবার ঘটনা। কেবল ভোটের লোভে ভেদাভেদের রাজনীতি করিয়া অন্ধ্রপ্রদেশে কংগ্রেস যে অবস্থার সৃষ্টি করিয়াছে তাহা ন্যক্কারজনক। ইহার পরও মনমোহন সিং বলিতেছেন বিজেপি বিভেদের রাজনীতিকে প্রশ্রয় দিতেছে। বস্তুত, কাশ্মীর হইতে কন্যাকুমারিকা পর্যন্ত ভেদাভেদ রাজনীতির প্রশ্রয় দিয়াছে কংগ্রেস। কারণ, ভোটের লোভে তাহাদের এই ভেদাভেদের রাজনীতি। কংগ্রেসের ভেদাভেদের রাজনীতির বলি কাশ্মীরের পণ্ডিত সম্প্রদায়। ভারতে বিভিন্ন সংস্কৃতি, ধর্ম, ভাষা রহিয়াছে। কিন্তু কংগ্রেসের ভেদাভেদ রাজনীতিতে একটি সম্প্রদায়কে তুষ্টিকরণের ফলে কাশ্মীরের পণ্ডিত সম্প্রদায় সর্বস্বান্ত হইয়া রাজ্য হইতে বিতাড়িত হইয়াছেন।

কংগ্রেসের ভেদাভেদ রাজনীতির ফলে অসমও আজ বিপর্যস্ত। কংগ্রেসের আর্থিক ভেদাভেদ নীতির ফলে সমাজে শ্রেণীবৈষম্য সৃষ্টি হইয়াছে। ধনী আরও ধনী হইয়াছে এবং গরিব আরও গরিব হইতেছে। ভেদাভেদ রাজনীতির জন্মদাতা বলিয়াই সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশ থাকিলেও কংগ্রেস দেশে সকলের জন্য এক আইন চালু করিতেছে না। ভেদাভেদের রাজনীতির প্রশ্রয়দাতা বলিয়াই কংগ্রেস দেশে একটি সম্প্রদায়কে তোষণ করিয়া থাকে এবং একটি সম্প্রদায়ের ধর্মগুরুদের নির্যাতন করিয়া থাকে। মনমোহন সিংয়ের ইতিহাস জ্ঞান অল্প বলিয়াই তিনি এমন মন্তব্য করিয়াছেন। একজন মাত্র ব্যক্তিকে ঘিরিয়াই তাঁহারা রাজনীতি করিয়া থাকেন। অথচ স্বয়ং একজন ব্যক্তির ক্রীতদাস হইয়া তিনি দেশ চালাইলেন আর বর্তমানে একজন ব্যক্তিকে তুষ্ট করিতেই প্রধানমন্ত্রী হইবার বাসনা ত্যাগ করিয়াছেন। অন্যদিকে, নরেন্দ্র মোদী বলিয়াছেন, 'আমি একটা মতাদর্শের ফসল। যে মতাদর্শে পরিবার হইতে সমাজ বড়। বাঁচা-মরা সবকিছুই দেশের জন্য।' বলা হইতেছে, মোদী প্রধানমন্ত্রী হইলে নাকি কুড়ি শতাংশ মানুষ আশঙ্কিত হইবেন। কিন্তু অপরদিকে এইবার বিজেপি ক্ষমতায় না আসিলে আশি শতাংশ জাতীয়তাবাদী ভারতীয়ের চরম সর্বনাশ হইবে। দেশের অস্তিত্ব বিপন্ন হইবে, দেশের মানুষের অবস্থা সঙ্গিন হইবে। আজ রাহুল গান্ধী দুর্নীতি লইয়া বক্তব্য রাখিতেছেন অথচ তাঁহার দলের সরকারের দুর্নীতি লইয়া তিনি নিশ্চুপ। সেইসব দুর্নীতিতে নিমজ্জিত ব্যক্তিদের তিনি ভোটের আসরে নামাইয়াছেন। একটা দুর্নীতিগ্রস্ত সরকারের দলীয় সহ-সভাপতি দুর্নীতি লইয়া জ্ঞান দিতেছেন ইহা চরম ভণ্ডামির নামান্তর। বিজেপি ধ্বংসাত্মক বলিয়া মনমোহন সিং বলিয়াছেন। অথচ তাঁহার প্রধানমন্ত্রিত্বকালে নিজের সরকারের দুর্নীতি ছাড়া অন্য কোনও সৃষ্টিশীল কর্ম অনুপস্থিত ছিল। কমনওয়েলথ কেলেঙ্কারি হইতে কয়লা কেলেঙ্কারির জন্মদাতা তিনি। তাঁহার প্রধানমন্ত্রিত্বকালেই দুর্নীতির বিশ্বরেকর্ড করিয়া দেশের মানসম্মান ভূলুণ্ঠিত হইয়াছে। প্রতিবেশী দেশের কাছে ভারতবর্ষ নীতিহীন, দুর্নীতিগ্রস্ত রাষ্ট্র রূপে চিহ্নিত হইয়াছে। অথচ তিনি বড় বড় বাক্য বলিতেছেন। প্রবাদ রহিয়াছে, 'চোরের মায়ের বড় গলা'। এখন চোরেরই বড় গলা দেখা যাইতেছে। বলা হইতেছে, মোদী ক্ষমতায় আসিলে দেশে সাম্প্রদায়িক হিংসা ও উত্তেজনা বৃদ্ধি পাইবে। কিন্তু যে সত্য কথাটি গোপন করা হইতেছে তাহা হইল, ২০০২ সালের পর হইতে গুজরাটে আর দাঙ্গা হয় নাই। বরং ভারতের অন্যান্য অ-বিজেপি শাসিত রাজ্যে নিয়মিত দাঙ্গা হইতেছে। অসমে কংগ্রেসী রাজত্বে দাঙ্গা হইয়াছে, উত্তরপ্রদেশে সমাজবাদী পার্টির রাজত্বে দাঙ্গা হইয়াছে, এমনকী পশ্চিমবঙ্গে তৃণমূল রাজত্বে দাঙ্গা হইয়াছে। আজ দেশের চরম দুর্বলতার ক্ষেত্রগুলি হইতেছে প্রশাসনিক ব্যর্থতা, অনৈতিকতা, বিশ্বাসযোগ্যতা ও আশাহীনতা। নরেন্দ্র মোদী প্রথমেই জানাইয়াছেন, তাঁহার প্রথম কাজই হইবে সুশাসন। সুশাসন ছাড়া দেশের উন্নয়ন সম্ভব নয়। অথচ মনমোহন সিংয়ের অভিধানে সুশাসন অনুপস্থিত ছিল। দুর্নীতিই ছিল তাঁহার সরকারের মূলমন্ত্র। অথচ গান্ধীজী সারা জীবন দেশের মানুষকে পরিচ্ছন্নতা মানিয়া চলার উপদেশ দিয়াছেন, কিন্তু আজ নকল গান্ধীরা দেশ হইতে পরিচ্ছন্নতা বিদায় করিতে তৎপর।

### জাতীয় জাগরণের মন্ত্র

*(নারীদের) অনেক সমস্যা আছে— সমস্যাগুলিও বড় গুরুতর। কিন্তু এমন একটিও সমস্যা নেই, 'শিক্ষা'— এই মন্ত্রবলে যার সমাধান না হতে পারে।*

*—স্বামী বিবেকানন্দ*

সংবাদ প্রতিবেদন

# ইন্ডিয়ান মুজাহিদীনের পাণ্ডা রিয়াজ ভাটকলকে ভারত-বিরোধী সন্ত্রাস চালাতে ২৬ কোটি টাকা দিয়েছিল আই এস আই

**নিজস্ব প্রতিনিধি** ॥ সংবাদসূত্র অনুযায়ী জেরার মুখে রিয়াজ ভাটকল সরাসরি কবুল করেছে গত তিন বছর ধরে পাকিস্তান ইন্টার সারভিস ইন্টেলিজেন্স (আই এস আই) তাকে ভারতে সন্ত্রাসবাদী কাজকর্মে লিপ্ত থাকতে নিয়মমাফিক টাকা যুগিয়ে গেছে। সম্প্রতি কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থাগুলি পাকিস্তান থেকে পাওয়া গোপন তথ্যগুলিতেও একই চাঞ্চল্যকর যোগাযোগের সমর্থন পেয়েছে। ভারতে পর পর কিছু অত্যন্ত বিপজ্জনক পাকিস্তানী সন্ত্রাসবাদী গ্রেপ্তার হওয়ার পর পাকিস্তানের তরফে ভাটকলের ওপর প্রবল চাপ সৃষ্টি করা হচ্ছিল। আই এস আই-এর তরফে ভাটকলকে অতি দ্রুত কিছু করে দেখাবার আদেশ দেওয়া হয়েছিল। গত অক্টোবরে পাটনায় মোদীর সভায় বিস্ফোরণ এস আই এম আই-র তরফে সংঘটিত হওয়ায়, সন্ত্রাসবাদী সংস্থা হিসেবে এস আই এম আই নাগাড়ে পিছিয়ে পড়ছিল। তাদের তরফে এই নিষ্ক্রিয়তার জন্য ভাটকলকে লাগাতার চাপ দেওয়া হতে থাকে এমনটাই জেরার মুখে জানিয়েছে রিয়াজ ভাটকল।

করাচীর অপারেটর রিয়াজ ভাটকল রুটিনমাফিক ভারতে ইয়াসিন ভাটকল, আসাদুল্লা আখতার, তেহসিন আখতার ওরফে মনু, জিয়াউর রহমান, সাকিব যারা সকলেই ইতিমধ্যে পাকড়াও হয়েছে তাদের প্রত্যেকেই পাকিস্তান থেকে Western India money transfer বা হাওয়ালা ডিলারদের মাধ্যমে ১ থেকে ২ লক্ষ টাকা জনা প্রতি পেয়ে থাকত। কিন্তু সম্প্রতি রিয়াজ-এর কাছে আই এস আই-এর তরফে দ্রুত ভারতে সন্ত্রাসী আক্রমণ তীব্র করতে এক বিরাট টাকা এসে পৌঁছয়। এ তথ্য দিয়েছেন এক উচ্চতম তদন্তকারী অফিসার।

*রিয়াজ ভাটকল*

উল্লেখ্য পাক অধিকৃত কাশ্মীরে যে ট্রেনিং চালানো হয় তার খরচা এর মধ্যে ধরা নেই। গত তিন বছরে কাশ্মীরের বাইরের সন্ত্রাসী কাজকর্মের জন্যই আলাদা ২৬ কোটি টাকা বরাদ্দ হয়েছিল।

বর্তমানে এনএটিও-র তরফে ওয়াজিরস্থানে কর্মরত বাবা সাজিদ ও মির্জা সাহাদাব বেগ ভারতে মুজাহিদীনের কাজকর্ম নিয়ে খুবই বিক্ষুব্ধ হয়ে পড়েছিল। এরাই ভারতে ২০০৭-০৮ এর সিরিয়াল বিস্ফোরণের সঙ্গে সক্রিয়ভাবে জড়িত এমনটাই জেরায় স্বীকার করেছে ইয়াসিন। অন্যদিকে ভারতীয় নিরাপত্তা সংস্থার উচ্চপদস্থ আধিকারিক জঙ্গিদের আড়িপাতা ফোন কলগুলির ভিত্তিতে সংগৃহীত তথ্য অনুযায়ী এরাও আই এস আই-এর তরফে রিয়াজ-কে পাঠানো বার্তায় সন্ত্রাসবাদী কাজকর্মের নতুন রাস্তা বাতলাবার ব্যাপারে চিন্তা ভাবনা করছে বলে প্রকাশ। আটক হওয়া ইয়াসিনের তথ্য অনুযায়ী গত ৬-৭ বছরে রিয়াজের আই এস আই-এর নেক নজরে থাকার কারণ হলো সে ভারতে ভারতীয় যুবকদেরই মগজধোলাই করে সন্ত্রাসবাদী ও জেহাদী বানানোর কৌশল সফলভাবে প্রয়োগ করতে শুরু করেছিল। এর ফলে টাকা পাঠিয়ে সন্ত্রাসে মদত দেওয়ার খরচাও অনেক কম পড়ছিল। অতীতে লস্কর-ই-তৈবা বা জৈসএ মহম্মদের মত সংস্থার সন্ত্রাসীদের পাকিস্থানে প্রশিক্ষণ দিয়ে ভারতে পাঠানো হোত। কিন্তু রিয়াজ সেই পদ্ধতিতে বদলই শুধু ঘটায়নি নিয়মিত নিখরচায় বিস্ফোরণও ঘটিয়ে গেছে।

সংবাদ প্রতিবেদন

# আধার কার্ডের কার্যকারিতা নিয়ে বিভ্রান্ত খোদ ইউ আই ডি এ আই

**নিজস্ব প্রতিনিধি॥** দেশের মানুষের কোটি কোটি টাকা নয়ছয় করে যে আধার কার্ড তৈরি করা হলো, তা কোন হোমে-যজ্ঞে লাগবে তা নিয়ে সাধারণ মানুষের কথা ছেড়ে দিন, আদালত এমনকী সংশ্লিষ্ট ইউনিক আইডেন্টিফিকেশন অথরিটি অব্ ইন্ডিয়া (ইউ আই ডি এ আই) কর্তৃপক্ষও বোধহয় বিভ্রান্ত। সমস্যার সূত্রপাত প্রায় সওয়া এক বছর আগে গোয়ার ভাস্কো শহরে এক স্কুলছাত্রীর গণধর্ষণকে কেন্দ্র করে। গোয়ার আদালত নির্দেশ দেয় এই অপরাধের যে সামান্য কিছু হাতের ছাপ উদ্ধার করা সম্ভব হয়েছে আধার কার্ডে নথিভুক্ত রাজ্যবাসীর বায়োমেট্রিক রেকর্ডের সঙ্গে তা মিলিয়ে অপরাধীদের খুঁজে বের করতে হবে। এই রায়ের বিরুদ্ধে বোম্বে হাইকোর্টের দ্বারস্থ হয়ে ইউ আই ডি এ আই কর্তৃপক্ষ বলে— এই রায় কার্যকর হলে তা সমাজের বিভিন্ন স্তরে কার্যকর হবে। এটা সুস্থ সমাজের পক্ষে কাম্য নয়। কিন্তু বোম্বে হাইকোর্টও তাদের হতাশ করে কেন্দ্রীয় ফরেন্সিক সায়েন্স ল্যাবরেটরি-কে নির্দেশ দেয় ইউ আই ডি এ আই ডেটাবেসের বায়োমেট্রিক তথ্যের প্রযুক্তিগত মান যাচাই করতে। এই রায়ের বিরুদ্ধে এখন সর্বোচ্চ আদালতের দ্বারস্থ হয়েছে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ। তাদের বক্তব্য, আধার কার্ডের যাবতীয় তথ্য সামাজিক কাজের জন্য, অপরাধের তদন্তের জন্য নয়।

ইউ আই ডি এ আই কর্তৃপক্ষের এই যুক্তি মেনে নিয়েও তথ্যাভিজ্ঞ মহল মনে করছেন এর ফলে নিজেদের সীমাবদ্ধতার কথাই প্রমাণিত করল। কোটি কোটি টাকা খরচা করে এই স্বতন্ত্র-পরিচয় পত্র তৈরি করার প্রয়োজনীয়তা নিয়েই প্রশ্ন উঠেছিল একটা সময়। পরে সময় গড়াতে দেখা গিয়েছে ভোটার পরিচয়পত্রের মতোই চূড়ান্ত অযত্নে আরেকটি পরিচয়পত্রের অবতারণা হচ্ছে। যার প্রয়োজন অন্তত এই মুহূর্তে নেই। এছাড়া বায়োমেট্রিক বিভিন্ন তথ্য এতে সন্নিবেশিত হলেও এর অস্পষ্টতা এতই প্রবল যে তাকে কোনও কাজে লাগানো দুঃসাধ্য। ফলে পরিস্থিতি আঁচ করেই বোম্বে হাইকোর্ট, পরে সুপ্রিম কোর্টে একে অপরাধী অনুসন্ধানের কাজে না লাগানোর আবেদন নিয়ে দ্বারস্থ হয় ইউ আই ডি এ আই।

বিরোধীরা বরাবরই এই স্বতন্ত্র পরিচয়পত্রের বিরুদ্ধে সরব হয়েছে। বিশেষ করে প্রধান বিরোধী দল হিসেবে বিজেপি মনে করেই এই পরিচয়পত্রকে সম্বল করে অনুপ্রবেশকারীরাও এদেশের নাগরিকত্ব দাবি করতে পারবে। দেশের কংগ্রেস পরিচালিত ইউ পি এ সরকারের এই ‘ফ্ল্যাগশিপ’ কর্মসূচি যে আদতে রাজনৈতিক উদ্দেশ্যপ্রণোদিত ছিল ইউ আই ডি এ আই প্রধান ও মূল মস্তিষ্ক নন্দন নীলেকানির কংগ্রেসের হয়ে ভোটে লড়ার সিদ্ধান্তেই তা প্রমাণ হয়ে গিয়েছে বলে রাজনৈতিক মহলের অভিমত।

সম্পতি ইউপিএ সরকারের বহুল প্রচারিত আধার কার্ড এখন পাকিস্তান ও বাংলাদেশ থেকে আসা নাগরিকদের কাছ থেকে মূল্য দিয়ে পাওয়া যাচ্ছে। ওয়েবসাইট কোবরাপোস্ট-এর স্টিং অপারেশন বা গোপন তদন্ত সূত্রে এই সংবাদ জানা গেছে। কোনো পরিচয় পত্র বা নির্দিষ্ট ঠিকানা ছাড়াই ৫০০ থেকে ২৫০০ টাকা দিলেই প্রজেক্ট অফিসার তা তৈরি করে দিতে পারে বলে অভিযোগ করা হয়েছে। ওয়েবসাইটের বক্তব্য, এই একই লোকেরা আধার কার্ডের জন্য ব্যক্তিবিশেষের বায়োমেট্রিক, জনসংখ্যাগত তথ্য ব্যাঙ্গালোরে ইউ আই ডি এ আই তথ্য কেন্দ্রে পাঠায়।

---

**স্বস্তিকা**

২৭/১বি, বিধান সরণি, কলকাতা - ৭০০ ০০৬,

স্বস্তিকা-র নববর্ষ সংখ্যা ১৪২১ বঙ্গাব্দ-এর আনুষ্ঠানিক প্রকাশ উপলক্ষে আগামী ১২ এপ্রিল ২০১৪, শনিবার সন্ধ্যা ৬টায় ‘কেশব ভবন’ (৯এ, অভেদানন্দ রোড, কলকাতা - ৬)-এ এক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছে। এই সভায় সভাপতিত্ব করবেন প্রখ্যাত সাহিত্যিক শ্রী রমানাথ রায়। প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থাকবেন ওড়িশার ‘রাষ্ট্রদীপ’ পত্রিকার সম্পাদক শ্রী জগবন্ধু মিশ্র। ‘পাইওনিয়র’ পত্রিকার সম্পাদক শ্রী চন্দন মিত্র প্রধান বক্তা হিসেবে উপস্থিত থাকবেন। অনুষ্ঠানে মেজর জেনারেল কে কে গঙ্গোপাধ্যায়-কে ‘স্বস্তিকা সম্মান’-এ ভূষিত করা হবে।

অনুষ্ঠানে আপনার উপস্থিতি আমরা একান্তভাবে প্রার্থনা করি।

সম্পাদক স্বস্তিকা

## যোগ চিকিৎসা

যে কোনও শারীরিক-মানসিক রোগ, মেধা স্মৃতি-বুদ্ধি বৃদ্ধি, পড়াশুনায় উন্নতি— বিশিষ্ট যোগ চিকিৎসক-গবেষক অধ্যাপক দীপেন সেনগুপ্তের তত্ত্বাবধানে সম্পূর্ণ ভারতীয় পদ্ধতিতে মাত্র ৭০০ টাকায় ভর্তির দিন থেকে ১ বৎসর যোগ চিকিৎসার ব্যবস্থা করা হয়েছে। চার বৎসর বয়স থেকে সদস্য/সদস্যা নেওয়া হচ্ছে।

**স্বামী সন্তদাস ইনস্টিটিউট অব কালচার,**
**যৌগিক কলেজ অ্যাণ্ড নার্সিং হোম,**

১০১, সাদার্ন অ্যাভিনিউ, কলকাতা-২৯ ফোন ঃ ২৪৬৪-৬৪৬৪, ২৪৬৩-৭২১৩ যৌগিক নার্সিংহোম (২০টা শয্যা) ঃ ২নং ঘোষপাড়া, নাজিরবাগান, ঢাকুরিয়া, কলকাতা-৭০০ ০৭৮ ফোন ঃ ২৪১৫-৩৫৬৬

## DAS STEEL UDDYOG

Naldubi, Mangalbari, Po.+Dist. : Malda

*সকল প্রকার স্টীল ফার্ণিচার,*
*গ্রীলগেট এবং ফেব্রিকেশনের*
*কাজ করা হয়*

**Show Room**

—ঃ যোগাযোগের ঠিকানা ঃ—

**GEETANJALI FURNITURE**
**Jhaljhalia, Station Road,**
**Malda**
**Phone : 03512-266063,**
**Mobile : 9733387091**

## বেঙ্গল সামুই ফ্যাক্টরী

**নিউ কমল ব্রাণ্ডের**

*ভাজা সামুই ব্যবহার করুন*
*মাত্র দুই মিনিটে ক্ষীর তৈরী হয়।*

শান্তিনিকেতন, বোলপুর
মোবাইল -৯২৩২৪০৯০৮৫

## KIND ATTENTION TO HOUSE OWNERS

"WATER SEAPAGE IS A DISEASE LIKE A CANCER OF YOUR DREAM HOME. REMOVE IT AND SAFE YOUR HOME"

**OUR SERVICES :**

** Heat & Waterproof Solution for your Heated Roof.
** Waterproof Treatment of Roof, roof Garden Water Tank, Lift Pit, Water Body Etc.
** Leakage, Dampness & Salt Petre Treatment.
** Anti-Termite & Pest Control Treatment

**CONTACT :**

**Calcutta Waterproofing Company**
**'Park Plaza'**
71, Park Street, Room No. 11/12, Kolkata-700 016
98311 85740/9831272657–
emil : roy4258@yahoo.com
web : www.calcuttawaterproofing.com

# দূষণকে পয়লা নম্বর ঘাতক বলে বর্ণনা হু-র

**নিজস্ব প্রতিনিধি** ॥ সারা বিশ্বে এই মুহূর্তে ‘বায়ু দূষণ’-কেই পয়লা নম্বর ঘাতক হিসেবে বর্ণনা করল বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা বা ওয়ার্ল্ড হেলথ অর্গানাইজেশন (হু)। এক পরিসংখ্যান উদ্ধৃত করে হু-র পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে বায়ু দূষণ জনিত কারণে ২০১২ সালে ৭০ লক্ষ মানুষের মৃত্যু হয়েছে। এঁদের মধ্যে আশি শতাংশ মানুষের হার্ট অ্যাটাক কিংবা স্ট্রোকে মৃত্যু হয়। গত ২৫ মার্চ এক বিবৃতিতে হু জানায় প্রতি ৮টি আন্তর্জাতিক মৃত্যুর মধ্যে অন্তত ১টি বায়ু-দূষণের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত। সাম্প্রতিক কালে বায়ু দূষণকে মূলত দু’টি ভাগে ভাগ করা হয়েছে। একটি বহির্দ্বার (আউটডোর), অপরটি অন্তর্দ্বার (ইনডোর)। বহির্দ্বার বায়ু-দূষণের কারণ হিসেবে বলা হচ্ছে গাড়ির ধোঁয়া, পাওয়ার স্টেশনের বর্জ্য, কৃষি ও শিল্পের নির্গমন এবং সাধারণ গৃহস্থের জ্বালানি ইত্যাদি। এইসব কারণে গ্রুপ ওয়ান কারসিনোজেনিক —ক্যান্সারের অন্যতম এজেন্ট যা কখনও কখনও ধূমপানের জন্যও হয়, অতি বেগুনী রশ্মির বিকিরণ ইত্যাদি সংঘটিত হয় যা মানুষকে মৃত্যুমুখে ঠেলে দেয়। হু-র ক্যান্সার গবেষণার আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠান ইন্টারন্যাশনাল এজেন্সি ফর রিসার্চ অন ক্যান্সার (আই এ আর সি)-র বক্তব্য, ‘মানুষের দেহে কারসিনোজেনেসিটির পর্যাপ্ত প্রমাণ আমরা পেয়েছি। এই ধরনের মৃত্যুর মধ্যে ছয় শতাংশই ঘটে ফুসফুসের ক্যান্সারের জন্য— যা বহির্দ্বার ও অন্তর্দ্বার উভয় বায়ু-দূষণের জন্যই হয় বলে হু-র অভিমত। এটাই প্রথমবার যেখানে হু সরাসরি দাবি করল যে বায়ু-দূষণ ও হৃদরোগের মধ্যে গভীর সম্পর্ক রয়েছে। শ্বাসকষ্ট ও ক্যান্সারও এক্ষেত্রে হাত ধরাধরি করে চলে বলে হু-র বিশেষজ্ঞরা জানিয়েছেন। পরিসংখ্যান উদ্ধৃত করে হু-র পক্ষ থেকে বলা হয়েছে মূলত নিম্ন বা মাঝারি আয় সম্পন্ন দেশগুলিতে বিশেষ করে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া ও পশ্চিম ভূমধ্যসাগরীয় এলাকায় ২০১২ সালে সর্বাধিক বায়ু-দূষণ সংঘটিত হয়েছিল— যার ফলে বহির্দ্বার বায়ু-দূষণের জন্য ২৬ লক্ষ ও অন্তর্দ্বার বায়ু-দূষণের কারণে ৩৩ লক্ষ মানুষের মৃত্যু হয়েছিল।

ড. ফ্লাডিয়া বাসট্রিও-হু-র পরিবার, মহিলা ও শিশুস্বাস্থ্য বিভাগীয় সহ ডিরেক্টর জেনারেল বলেছেন : বায়ু-দূষণের ফলে সামগ্রিকভাবে সবাই ক্ষতিগ্রস্ত হলেও মহিলা ও শিশুরা এর ফলে চরম ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছেন। বিশেষ করে দরিদ্র মহিলা ও শিশুরা যারা অধিকাংশ সময়ই গৃহস্থালির কাজে পেটের দায়ে নিযুক্ত থাকেন বা থাকতে বাধ্য হন তাদের অবস্থা আরও শোচনীয়। কয়লা কিংবা স্টোভের ধোঁয়ার মধ্যে এরা যে শ্বাস নেন তাতে বিষবাষ্প এদের শরীরে প্রবেশ করে দ্রুত মৃত্যুর কারণ হয়। হু-র বিশ্লেষণ এও বলছে— কয়লার উনুন কিংবা স্টোভের মধ্যে দিয়ে যে অন্তর্দ্বার বায়ু-দূষণের সৃষ্টি হয় তাতে ২০১২ সালে ৪৩ লক্ষ মানুষের মৃত্যু হয়েছে।

## পাকিস্তান সমর্থকদের ঔদ্ধত্য

**নিজস্ব প্রতিনিধি** ॥ হাওড়া জেলার পাঁচলা ব্লকের বেলডুবি হাইস্কুলের শিক্ষক তন্ময় কুণ্ডুকে প্রকাশ্যে ক্ষমা চাইতে বাধ্য করা হলো। তাঁর অপরাধ— গত ২৫ মার্চ বেলা এগারোটা নাগাদ তিনি স্কুলের কয়েকজন অষ্টম শ্রেণীর ছাত্রকে কৌতূহলবশত জিজ্ঞেস করেছিলেন —তুমি কোন দেশের সমর্থক? উল্লেখ্য, ওই সময় ভারত-পাকিস্তানে ক্রিক্রেট খেলার রেশ চলছিল। তাদের মধ্যে একজন ছাত্র সদর্পে বলেছিল যে আমি পাকিস্তানের সমর্থক। যে কোনো ভারত-প্রেমিক মানুষের কাছে এটা আঘাত স্বরূপ। ছাত্রদের প্রতি শিক্ষকদের শাসনের যে অধিকার থাকে তার সীমার মধ্যে তন্ময়বাবু ছাত্রটিকে শাসন করেছিলেন এবং বলেছিলেন, স্বাধীনতার পরের দিন থেকেই পাকিস্তান আমাদের দেশ আক্রমণ করে, তাই সে দেশের সমর্থক হওয়া ঠিক নয়।

এর পরিপ্রেক্ষিতে ধর্মীয় উন্মাদনায় সম্প্রদায় ভিত্তিক জোটবদ্ধ স্থানীয় জনতা তন্ময়বাবুকে ক্ষমা চাইতে বাধ্য করে। যেভাবে তন্ময়বাবু ও স্কুলের সমস্ত শিক্ষককে সেদিন চরম হেনস্থা করা হয়েছে, তার প্রতিবাদে গ্রামের সকল শুভবুদ্ধিসম্পন্ন মানুষ সোচ্চার প্রতিবাদ জানিয়েছে। প্রশাসনের কাছে অবিলম্বে ওইসব অসামাজিক ব্যক্তিদের চিহ্নিত করে শাস্তি বিধানের দাবি জানিয়েছে।

## বিজেপি করার অভিযোগে হিন্দুদের ওপর আক্রমণ

**সংবাদদাতা** ॥ হিন্দু হলে বিজেপি করা যাবে না, বিজেপি-র দেওয়াল লেখা যাবে না, বিজেপি করলে ভাঙ্গড়ের সংখ্যালঘু হিন্দুদের কচুকাটা করা হবে। উত্তরপ্রদেশের শাহরানপুরের প্রার্থী ইমরান মাসুদ খানের মতো আর একটি ঘটনার সাক্ষী হলো জয়নগর লোকসভা কেন্দ্রের অন্তর্গত ভাঙ্গড়ের সুন্দিয়া গ্রামের হিন্দুরা। ঘটনার সূত্রপাত ২৯ মার্চ সকাল আটটা নাগাদ। বিজেপি-র চুন করা দেওয়ালে তৃণমূল নেতা সৌকত মোল্লার নির্দেশে সিপিএম-এর তৃণমূলে যোগ দেওয়া হার্মাদবাহিনী জোর করে লেখা শুরু করে। স্থানীয় বিজেপি কর্মীরা দেওয়াল লেখায় বাধা দিলে চনন্দেশ্বর-১-এর তৃণমূল নেতা সাহাজান মোল্লার নেতৃত্বে বিভিন্ন মুসলিম গ্রাম থেকে তৃণমূল কর্মীদের জড়ো করে। পুলিশের সামনে বিজেপি কর্মীদের লাঠি দিয়ে মার ও বোমাবাজি শুরু হয়। ছাড় পায়নি হিন্দু মহিলারাও। পুলিশ নীরব দর্শকের ভূমিকা পালন করে। মারের ফলে জখম হয় ভাদুড়ি মণ্ডল, বাপ্পা মণ্ডল, সন্টু মণ্ডল, লব মণ্ডল, খটু ব্যানার্জি, কুশ মণ্ডল। ঘটনা ঘটে যাওয়ার পর ভাঙ্গড় থানার ওসি বিশাল পুলিশ ও র‍্যাফ নিয়ে ঘটনাস্থলে উপস্থিত হয়। এলকায় চাপা উত্তেজনা থাকায় র‍্যাফের টহলদারি চলছে। প্রতিবাদস্বরূপ তৃণমূল নেতা ও কর্মীদের বিরুদ্ধে থানায় এফ আই আর করে বিজেপি কর্মীরা।

# ‘নোটা’ বোতাম টেপার অর্থ সংসদীয় গণতন্ত্রের প্রতি অনাস্থা প্রকাশ

এবারের লোকসভার নির্বাচনে অন্যতম চমক হচ্ছে ভোট মেশিনের লাল বোতাম। অর্থাৎ, ভোটদাতাদের কেউ যদি মনে করেন তাঁদের সংসদীয় কেন্দ্রের একজন প্রার্থীও প্রতিনিধিত্ব করার উপযুক্ত নন তবে তিনি ভোটযন্ত্রের শেষ বোতামটি টিপবেন। সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশে এই বিশেষ বোতামটি নির্বাচন কমিশন রেখেছে। এই বোতাম টেপার অর্থ ভোটদাতাদের জানিয়েছেন, ‘নান অব দ্য অ্যাবভ’। সংক্ষেপে ‘নোটা’। গত নভেম্বর-ডিসেম্বর মাসে দেশের পাঁচটি বিধানসভার নির্বাচনে প্রথম ‘নোটা’ বোতাম বৈদ্যুতিন ভোটযন্ত্রে রাখা হয়। কিন্তু দেখা গেছে, খুবই কমসংখ্যক ভোটদাতা নেগেটিভ বোতামটি ব্যবহার করেছেন। এই বিষয়টি নিয়ে তখন মিডিয়া নীরব থাকাই শ্রেয় মনে করেছিল। কিন্তু এবার মিডিয়া তরুণ ও যুব ভোটদাতাদের ‘নোটা’ বোতাম ব্যবহারে উৎসাহ দিচ্ছে। এর একটা কারণ দেশের জাতীয় গণমাধ্যম সাধারণভাবে কংগ্রেস ও তার দোসর বামপন্থীরা কবজা করে রেখেছে। নরেন্দ্র মোদীর নেতৃত্বে বিজেপি-র জয়রথ রুখতে অন্য কোনো পথ না পেয়ে নবীন প্রজন্মের ভোটদাতাদের উৎসাহ দিচ্ছে ‘নোটা’ বোতাম টিপতে। কংগ্রেস ও বামপন্থীরা বুঝে গেছেন যে এবার তাঁদের অবস্থা খুবই খারাপ। পাঁচ রাজ্যের বিধানসভার নির্বাচনে ‘নোটা’ নিয়ে সংবাদমাধ্যম উৎসাহ দেখায়নি। কিন্তু মোদী ঝড়ে কংগ্রেস উড়ে যাওয়ার পরেই সংবাদমাধ্যম ‘নোটা’ বোতাম টিপতে তরুণ প্রজন্মের ভোটদাতাদের প্ররোচনা দিচ্ছে।

সংবাদমাধ্যমের লক্ষ টাকা মাস মাহিনার সাংবাদিকদের কাছে আমার প্রশ্ন, ‘নোটা’ বোতাম টেপার অর্থ ভারতের সংসদীয় গণতন্ত্রের প্রতি অনাস্থা জানানো নয় কি? বিশ্বের সর্ব বৃহৎ গণতান্ত্রিক দেশ বলে আমরা গর্ব করবো। পৃথিবীতে এত বড় গণতান্ত্রিক নির্বাচন কোথাও হয় না। তারপরে সংবাদমাধ্যম শিক্ষা দেবে যে কোনও দল বা কোনও প্রার্থীকেই ভোট দিও না। তর্কের খাতিরে মেনে নিচ্ছি যে দেশের সব স্বীকৃত রাজনৈতিক দল দুর্নীতিবাজ। দেশ ও সমাজের ভাল করবে না। করতে পারে না। সেক্ষেত্রে অনেক যোগ্য নির্দল প্রার্থীও থাকতে পারেন। আমি কাউকেই পছন্দ করি না, এমন কথা আত্মসর্বস্ব স্বার্থপর অমানুষরাই বলে। সবাই খারাপ, সবাই চোর, এমন কথা যারা বলে বা বিশ্বাস করে তাদের নিজেদের চরিত্রটি কেমন একবার ভেবে দেখা প্রয়োজন। কট্টর বামপন্থী সাংবাদিক-সম্পাদক তরুণ তেজপালের চরিত্রহীনতা থেকে সবাই জেনেছেন। বামপন্থী সমাজকর্মী তিস্তা শীতলাবাদের বিরুদ্ধেও আর্থিক দুর্নীতির অভিযোগে আদালতে মামলা দায়ের করা হয়েছে। এরাই ‘নোটা’ বোতাম টিপতে উৎসাহ প্ররোচনা দিচ্ছে।

**গূঢ়পুরুষের**

**কলম**

দেশের সর্বোচ্চ আদালত একটি মামলায় বলেছিল, ভোটযন্ত্রে ‘নেগেটিভ অপসান’ থাকা উচিত। প্রার্থীদের কাউকেই যদি পছন্দ না হয় তবে সে কথা স্পষ্টভাবে জানাবার অধিকার ভোটদাতাদের থাকা উচিত। এর প্রেক্ষিতটা জানা দরকার। মামলাটি ভোট জালিয়াতির। দেখা গেছে ১০০ শতাংশ ভোটদাতার মধ্যে গড়ে ২৫ শতাংশ ভোট দেন না। এই অনুপস্থিত ভোটদাতাদের ভোটটি দেয় ক্ষমতাসীন দলের মস্তানরা। পুলিশ-প্রশাসন-ভোটকর্মীদের যোগসাজসে ভোট জালিয়াতি চলে আসছে সেই পঞ্চাশের দশক থেকেই। ‘নোটা’ বোতামটি রাখা হয়েছে ভোট জালিয়াতি রুখতে। আপনার ভোটটি আপনার অনুপস্থিতির সুযোগে অন্য কেউ যাতে দিতে না পারে তার জন্য। ঠিক এই কারণেই এবার ইভিএমের বোতাম টেপার পরেই একটি ছোট ছাপা কাগজ যন্ত্র থেকে বেরিয়ে আসবে। সেই কাগজে লেখা থাকবে আপনার ভোটটি ঠিক কোন প্রার্থী পেলেন। এই ব্যবস্থা রাখা হয়েছে ভোটদাতাকে নিশ্চিত করতে যে তিনি যাঁকে ভোট দিয়েছেন বোতাম টিপে সেই প্রার্থীই ভোটটি পেয়েছেন। এতকাল একটা সন্দেহ থেকে যেত যে বোতাম টিপলাম বিজেপি-র প্রার্থীকে ভোট দিতে অথচ ভোটযন্ত্রের কারচুপিতে ভোটটি চলে গেল সিপিএম বা তৃণমূলের প্রার্থীর ঝুলিতে। বাম আমলে এমন অভিযোগ সর্বত্র শোনা যেত। একটু ফিরে তাকালে মনে পড়বে ভোটের দিন বেলা ৬টা পর্যন্ত ভোট পড়েছে ৫৬ শতাংশ। ভোট গণনার সময় দেখা গেল ভোট পড়েছে ৭৫ শতাংশ থেকে ৮০ শতাংশ। কেন এমন হতো আশা করি তা বুঝিয়ে বলতে হবে না। যে কথাটা সকলেরই বোঝার প্রয়োজন আছে যে ‘নোটা’ বোতমটি অনুগ্রহ করে যতটা সম্ভব কম ব্যবহার করুন। কংগ্রেস দুর্নীতিপরায়ণ বলে সব দলই দুর্নীতিবাজ এতটা সরলীকরণ করবেন না। তৃণমূলনেত্রীর সাঙ্গোপাঙ্গোরা হুমকি দিচ্ছে বলে আর কোনও দলেই সভ্য, ভদ্র, বিনয়ী কর্মী নেই— এমনটা ভাবা কী ভুল নয়। এই রাজ্যের কোনও সংসদীয় কেন্দ্রে কেউ কী শুনেছেন বিজেপি কর্মী বা স্বয়ংসেবকরা মানুষের সঙ্গে দুর্ব্যবহার করেছেন। অতীতেও কেউ শোনেননি বিজেপি কর্মী সমর্থকরা বন্দুক, বোমা, পিস্তল নিয়ে বুথ দখল করেছে। তৃণমূল নেত্রী বিজেপি-কে হিন্দু সাম্প্রদায়িক দল বলে বাংলার মানুষকে ভোট দিতে বারণ করছেন। অথচ তাঁর মুসলিম তোষণ দেখে কী মনে হচ্ছে না যে দেশের সবচেয়ে বড় সাম্প্রদায়িক দল তৃণমূল। ব্যক্তিগতভাবে আমার মনে হয় এই কথাটাই রাজ্য বিজেপি নেতৃত্বকে জোর গলায় বলতে হয়। নির্বাচনী সভায় স্পষ্টভাবে জানাতে হবে যে তৃণমূল নেত্রী পশ্চিমবঙ্গে হিন্দু-মুসলমান বিভাজন নীতি নিয়েছেন। তিনি প্রচার করছেন, বিজেপি মুসলমানের শত্রু দল। তবে বিজেপি নেতৃত্ব কেন পাল্টা বলবে না যে তৃণমূল হিন্দু বিরোধী দল। ‘তুমি অধম, তাই বলে আমি উত্তম হব না কেন?’ নির্বাচনী যুদ্ধে এতটা ভালমানুষী বোধহয় চলে না।

# লক্ষ্মণের বনবাসে জেলের ভয় বুদ্ধদেবের

**মাননীয় বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য**
**প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী, পাম এভিনিউ**

শেষ পর্যন্ত লক্ষ্মণ শেঠকে বহিষ্কার করলেন আপনারা। তবে তার আগেই তমলুকের প্রাক্তন সাংসদ দল ছাড়ার সিদ্ধান্ত জানিয়ে দেন। তাঁর বক্তব্য, এখন দলের এই সিদ্ধান্ত মরার ওপর খাঁড়ার ঘা। আগেই যখন পার্টির সদস্যপদ নবীকরণ করাবেন না বলে জানিয়েছেন তার মানেই তো তিনি আর দলে নেই। সেটা অবশ্য ভুল নয় বুদ্ধবাবু। আপনারা অবশ্য বরাবরই মরার ওপর খাঁড়ার ঘা দিতে অভ্যস্ত। মানতে চাইছেন না? ঠিক আছে মনে করাচ্ছি।

সিপিএম ক্ষমতাচ্যুত হওয়ার পর অনিল বসু, আব্দুর রেজ্জাক মোল্লার পর লক্ষ্মণ শেঠ— তিন বিদ্রোহীকে বহিষ্কার করেছে সিপিএম। সব বহিষ্কারের ক্ষেত্রেই তো মরার ওপর খাঁড়ার ঘা দিয়েছেন আপনারা। অনিল বসু দল ছাড়ার সিদ্ধান্ত নিয়ে তাঁর বাড়িতে সাংবাদিক সম্মেলন করেছিলেন। রেজ্জাক মোল্লা দল কবে বহিষ্কার করে সেই অপেক্ষাতেই নিজের আলাদা দল তৈরির ঘোষণা করে দেন। আর লক্ষ্মণ শেঠ তো আগেই সদস্যপদ পুনর্নবীকরণে অনিচ্ছা জানিয়ে দেন। তিনটি ঘটনাতেই দেখা যাচ্ছে কোনও নেতাই যখন আর দলে থাকতে চাইছেন না সেটা বোঝার পর অনেক অপেক্ষা করে তবে চরম সিদ্ধান্ত নিয়েছে আপনার দল।

কিন্তু বুদ্ধবাবু, লক্ষ্মণের কেসটা আলাদা। উনি আবার আপনার অনেক কুকর্মের সঙ্গী। সব জানেন তিনি। ইতিম্যধ্যে সেসব বলতেও শুরু করেছেন। বলেছেন নন্দীগ্রাম কাণ্ডে আপনি বুদ্ধদেব ভট্টাচার্যই দায়ী। আপনার তখনই পদত্যাগ করা উচিত ছিল। এখানেই না থেমে লক্ষ্মণ মিডিয়াকে বলেছেন, এখন দল চালাচ্ছেন বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য। গণতন্ত্র বলে কিছু নেই। আর হাসতে হাসতে মানুষ খুন করতে পারেন বুদ্ধদেব। আর নন্দীগ্রাম কাণ্ডে নিজের সাদা পোশাক কালির দাগ থেকে বাঁচাতে তাঁকেই বলির পাঠা করেছেন আপনি।

আপনাকে এই ভোটের বাজারে অস্বস্তিতে ফেলতে লক্ষ্মণের দাবি, ২০০৭ সালের ১৪ মার্চের পরই বুদ্ধদেবের পদত্যাগ করা উচিত ছিল। তাঁর দাবি, সব জেনেও তিনি কিন্তু আপনি মিথ্যা প্রচার করে দলের শৃঙ্খলাভঙ্গ করেছেন। সেজন্য আপনাকেও দল থেকে বহিষ্কার করা উচিত বলে মত আপনার একসময়ের সম্পদের। শুধু আপনিই নয়, রাজ্য সম্পাদক বিমান বসুকেও আগেই দল থেকে বহিষ্কার করা উচিত ছিল বলে উনি মনে করছেন। কাঠগড়ায় তুলেছেন, সূর্যকান্ত মিশ্র সহ সব নেতাকেই। অসুস্থতার কারণে ছাড় দিয়েছেন সিঙ্গুর-নন্দীগ্রাম কাণ্ডে আপনার অপর সঙ্গী নিরুপম সেনকে।

এই অবধি সহ্য করা যায়। কিন্তু বর্তমান মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের যেভাবে উনি প্রশস্তি করছেন তা ভাবা যায় না। আসলে নন্দীগ্রাম মামলায় ফেঁসে এখন বাঁচার পথ খুঁজতেই যে লক্ষ্মণের এই স্ট্র্যাটেজি তা আপনি না বুঝলেও রাজ্যের বাচ্চা বাচ্চা ছেলেমেয়েরাও বোঝে। আর এটাও সবাই জানে যে তৃণমূল কংগ্রেসেই লক্ষ্মণকে মুক্তির শর্ত হিসেবে এসব বলাচ্ছে।

রাজসাক্ষী হয়ে লক্ষ্মণ বলছেন, নন্দীগ্রামের ব্যাপারে ওনার কোনও দায়ই ছিল না। সব দায় আপনার। আপনার নির্দেশেই মানে মুখ্যমন্ত্রী কমরেড বুদ্ধদেব ভট্টাচার্যের নির্দেশেই তিনি সাধারণ গ্রামবাসীর ওপর আক্রমণ, ধর্ষণ, বাড়িতে আগুন লাগানো এবং খুনের মতো কাজ করেছেন। নেতৃত্বের নির্দেশে নিছক পুতুল নাচের পুতুলের মতোই তিনি সেসব করেছেন। কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে, তিনিও তো সেই সময় দলের রাজ্য নেতৃত্বের অংশ ছিলেন।

এই প্রশ্নটা আমার। আপনাকেও ধার দিলাম বুদ্ধবাবু। এই প্রশ্নটাই সম্বল করুন। কারণ বর্তমান সরকার আপনাকে ফাঁদে ফেলতে লক্ষ্মণের সাক্ষী অনুসারে আপনার বিরুদ্ধে প্রশাসনিক ব্যবস্থা নিতে পারে। তখন দয়া করে এই প্রশ্নটা তুলবেন। জেলে যদি যেতেই হয় লক্ষ্মণকেও সঙ্গে নিয়ে যাবেন। একাকী যাবেন না আপনি অসময়ে।

— **সুন্দর মৌলিক**

উত্তর সম্পাদকীয়

# টিপু সুলতান মসজিদের শাহী ইমাম এখন মমতার প্রধান পরামর্শদাতা

**এন. সি. দে**

যত নির্বাচন এগিয়ে আসছে, মমতার নরেন্দ্র মোদী বিরোধিতা ততই তীব্র থেকে তীব্রতর হয়ে উঠছে, কংগ্রেস-বিরোধিতার সুর যেন অনেকটাই স্তিমিত হয়ে আসছে। সিপিএম-বিরোধিতাও যেন বেশ দমে গেছে। যে মমতা কংগ্রেস ও সিপিএম-কে গালমন্দ না করে জল খেতেন না, যে মমতার রাজনীতির মূল কথাই ছিল কংগ্রেস- সিপিএম বিরোধিতা, সেই মমতার মুখে এখন সদাই দাঙ্গা আর বাংলা ভাগের কথা। যা পরোক্ষভাবে হিন্দু-মুসলমান বিদ্বেষকে জাগিয়ে রাখছে। যে বিজেপি গোর্খাল্যান্ডের কোনও কথাই বলেনি, সেই বিজেপি-র বিরুদ্ধে মমতা সমানে বলে চলেছেন— বিজেপি বাংলা ভাগ করছে, দাঙ্গা বাঁধাবার চেষ্টা করছে ইত্যাদি, ইত্যাদি। কংগ্রেস-সিপিএম-এর বিরুদ্ধে তাঁর ক্ষোভ আজ অনেকটাই স্তিমিত, বিজেপি-র বিরুদ্ধে তাঁর এই হঠাৎ বিদ্বেষ-পরায়ণতার কারণ কি? কিছুদিন আগেও মমতা বলেছিলেন যে বিজেপি পশ্চিমবাংলায় কোনও ফ্যাক্টরই নয়। তিনি নানান ভাবে অসংগঠিত হিন্দু জনগোষ্ঠীকে তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য করতেন। আজ তাঁর এই পরিবর্তন কেন? তাহলে কি মমতা এবার পশ্চিমবাংলাতেও বিজেপি-কে ভয় পাচ্ছেন? না কি বিশ্ব ইসলামি মৌলবাদের সঙ্গে গাঁটছড়া বাঁধা এ-দেশের মোল্লা-মৌলবী-ইমাম- শরীফদের তৈরি নতুন কোনো ফাঁদে তিনি পা দিয়েছেন?

আগেও বারবার বলেছি যে মুসলমান সম্প্রদায় রাজনীতি, রাজনৈতিক দল এবং নির্বাচনকে নিজেদের মৌলবাদী স্বার্থে ব্যবহার করতে সিদ্ধহস্ত, ভারতকে ওরা ‘হিন্দুস্থান’ বলে থাকে, ওদের ভাষায় যা ‘দার-উল-হারব’ অর্থাৎ শত্রুভূমি। তাই হিন্দুস্থানের রাষ্ট্রকে ‘দার- উল-ইসলাম’ অর্থাৎ ইসলাম রাষ্ট্রে পরিবর্তন করাটাই তাদের মূল লক্ষ্য। ভারতের মতো বৃহৎ গণতান্ত্রিক ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্রকে কেবলমাত্র হিংসার দ্বারা দখল করা সম্ভব নয়— একথা ওরা জানে। তাই তারা টার্গেট করেছে এদেশের গণতান্ত্রিক ধর্মনিরপেক্ষ সংসদীয় রাষ্ট্রব্যবস্থাকে, যে ব্যবস্থায় সংখ্যাই ক্ষমতার ভারসাম্য নির্ধারণ করে। সংখ্যায় জনাধিক্য থাকলেই চলবে না, রাষ্ট্র পরিচালনায় নির্ণায়ক ভূমিকায় থাকা চাই, তা নাহলে সেই সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগোষ্ঠীর কোনও মূল্য নেই। রাষ্ট্র গঠনে অর্থাৎ সরকার গঠনে তাদের কেউ গ্রাহ্যই করে না। স্বাভাবিকভাবেই যে জনগোষ্ঠী সচেতনভাবে সংগঠিত রাজনৈতিক দলগুলির কাছে তাদেরই কদর বেশি। মুসলিম জনগোষ্ঠী একটি ধর্মীয় মৌলবাদী সম্প্রদায় হওয়ায় তাদের উপর ধর্মগুরুদের প্রভাব প্রশ্নাতীত। সেই কারণে সংখ্যাধিক্য থাকা সত্ত্বেও শুধুমাত্র অসংগঠিত হওয়ায় হিন্দু জনগোষ্ঠী কখনই রাষ্ট্র গঠনে নির্ণায়ক ভূমিকায় থাকতে পারছে না। তাই সব রাজনৈতিক দলই হিন্দুদের বা বিজেপি-কে তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য করে থাকে। অপরদিকে মুসলমান জনগোষ্ঠী তাদের মোল্লা-মৌলবীদের দ্বারা সুচতুর ভাবে পরিকল্পিত উদ্দেশ্যে সংগঠিত হওয়ায় সব রাজনৈতিক দলই তাদের তোষামোদ করে থাকে। এই তোষামোদকে তারা পুরো মাত্রায় রাষ্ট্র দখলে কাজে লাগাতে নেমে পড়েছে।

এর প্রমাণ টিপু সুলতান মসজিদের শাহী ইমাম মৌলানা বরকতির ব্রিগেডে তৃণমূলের সভামঞ্চে মমতাকে দেওয়া নির্দেশ। এই সভার আগে মমতা বারবার বলে এসেছেন যে তৃণমূল এবারের নির্বাচনে ‘একলা চলবে’, দিল্লীতে নির্বাচনের পরেও কোনো ফ্রন্টকেই সমর্থন করবে না। ‘একজন আবেগপ্রবণ হিন্দু নেতা বা নেত্রী একথা বলতেই পারেন, কিন্তু আবেগহীন প্রচণ্ড বাস্তববাদী মুসলমান নেতা মোল্লা- মৌলবী নেতাদের কাছে মুসলিম ভজনাকারী তথাকথিত ধর্ম-নিরপেক্ষ নামধারী সমস্ত দলের হাতে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা ধরে রাখাটাই সবচেয়ে জরুরি। তাদের লক্ষ্য যেহেতু ভারত রাষ্ট্র, তাই স্বাভাবিকভাবেই তাদের প্রধান ত্রাতা কংগ্রেসই। এই উদ্দেশ্যে বার্তা দিতে ইমাম মৌলানা স্বয়ং ব্রিগেডের মমতার মঞ্চে হাজির হয়ে হুংকার ছাড়লেন ওইসব ‘একলা চলো-টলো’-তে চলবে না— ‘দিল্লী চলো’র ডাক দাও। পশ্চিমবাংলার বাইরে সর্বত্র বিজেপি-র বিরুদ্ধে প্রার্থী দাও। নরেন্দ্র মোদীকে আটকাতে মুসলমান তোষণবাদী সমস্ত ধর্মনিরপেক্ষবাদীদের হাত শক্ত কর, নির্বাচনের পরে কংগ্রেস-সহ সমস্ত দলের সরকার তৈরির বার্তা দাও। এই শুরু মমতার দিল্লী দখলের স্ট্র্যাটেজি। রাজ্যে রাজ্যে তিনি প্রার্থী দিচ্ছেন। তবে বেশির ভাগই মুসলমান। এঁদের পিছনে টাকা ঢালবে কে? সেটা অবশ্য ‘গোপন এজেন্ডা’। তবে বেশির ভাগ মুসলমান প্রার্থী দেওয়াতে তা কিছুটা পরিষ্কার। এর আগে রাজ্যসভাতেও তিনি অনেক মুসলমান মৌলবাদীদের প্রার্থী করেছেন।

মৌলানাজী গত ১৮ মার্চ এক সাংবাদিক বৈঠকে আরো স্পষ্ট করে বলেছেন, আমি তৃণমূল কংগ্রেস, মায়াবতীর বি.এস.পি, কংগ্রেস-সহ সব ধর্মনিরপেক্ষ দলকে পরামর্শ দিয়েছি ঐক্যবদ্ধ হয়ে নরেন্দ্র মোদীকে আটকাও। বামপন্থীদেরও বার্তা দিয়েছি, তাঁর মতে, নরেন্দ্র মোদী শুধু মুসলিমদের কাছে নয়, ধর্মনিরপেক্ষ হিন্দুদের কাছেও চরম বিপদস্বরূপ। শাহী ইমামের পরামর্শের প্রতিফলন আমরা দেখতে পাচ্ছি সব কটি

স্বঘোষিত ধর্মনিরপেক্ষ নামধারী দলীয় নেতাদের মুখে। মমতার কংগ্রেস- সিপিএম-বিরোধী হুঙ্কার উধাও, মায়া-মুলায়ম-র কংগ্রেস সম্পর্ক নীরবতা পালন, বুদ্ধবাবুতো সরাসরি বলে দিয়েছেন যে নির্বাচনের পর দরকার পড়লে ২০০৪ সালের মতো পুনরায় কংগ্রেসকে সরকার গড়তে সমর্থন করবে। লালুকে তো পদাঘাত করলেও কংগ্রেসকে ছেড়ে যাবে না।

এ বড় শক্ত ঘাঁটি মমতাদি, মমতা বাড়ালে মায়া-জালে তো ফাঁসতেই হবে। যেমন ফেসেছিল যোগেন মণ্ডলরা। পূর্ববঙ্গকে পূর্বপাকিস্তান বানাতে মুসলমান মৌলবাদীদের মদত দিয়েছিল যোগেন মণ্ডলের সিডিউল কাস্ট ফেডারেশন। সামান্য মন্ত্রী হওয়ার লোভে তিনি একাজ করেছিলেন। পরে ভুল বুঝতে পারলেও আর কিছু করার ছিল না। ১৯৫৬ সালেই পাকিস্তান গণপরিষদে পাকিস্তানকে ইসলাম রাষ্ট্রে পরিণত করার সিদ্ধান্তেও তাঁকে সমর্থন দিতে বাধ্য হতে হয়েছিল। পরের ইতিহাস শুধুই খুন, ধর্ষণ আর হিন্দু উৎখাতের ইতিহাস। যোগেন মণ্ডলকেও পালিয়ে আসতে হয়েছিল এই নিরাপদ হিন্দুস্থানেই যাকে তিনি উচ্চবর্ণের হিন্দুভূমি বলে কটাক্ষ করতেন। তিনি তো ছিলেন নিম্নবর্ণের হিন্দু (যদিও তিনি নমঃশূদ্রদের হিন্দু বলেই মনে করতে ঘৃণাবোধ করতেন)। কিন্তু আজকের বুদ্ধ-মমতারা তো উচ্চবর্ণের, তাঁরাও কি নিজেদের আজ হিন্দু বলতে ঘৃণাবোধ করেন?

সবচেয়ে দুঃখের বিষয়, আজ মুসলমান ইমামদের মুখে ধর্মনিরপেক্ষতা পাঠ নিতে হচ্ছে যে ধর্মে ধর্মনিরপেক্ষতা একটা 'গুনাহ' (পাপ)। কেন মুসলমান-সংখ্যাগরিষ্ঠ দেশে কোনো ধর্মনিরপেক্ষতা অর্থাৎ সকল ধর্মের মানুষের সমান মর্যাদা বা অধিকার নেই? কেন মুসলমান-সংখ্যাগরিষ্ঠ দেশ ইসলাম রাষ্ট্র? কেন ইসলাম-রাষ্ট্রে 'ব্ল্যাসফেমি আইন' (ইসলাম অবমাননা বিরোধী আইন) থাকে? এই সব প্রশ্নের উত্তর কি দেবেন ভারতরাষ্ট্রের ধর্মনিরপেক্ষতার জন্য উদ্বিগ্ন ইমামজী। এটাই ইসলামের বিধান। অন্য ধর্মের প্রতি উদারতা, সহনশীলতা, পরমত-সহিষ্ণুতার জায়গা সেখানে নেই।

আগে তাঁরা মুসলমান, পরে ভারতীয়। মুসলমানের ভারতীয় জাতীয়তা নেই, আছে বিশ্ব মুসলিম ভ্রাতৃত্ব। তাইতো আমরা দেখি আজীবন কমিউনিস্ট পার্টিতে থেকেও রেজ্জাক মোল্লা হজ করে এসে হাজি হয়েছেন; তাঁর পার্টিতেও নেতৃত্বে মুসলিম সংরক্ষণ দাবি করছেন। পার্টি থেকে বহিষ্কার হয়ে এখন তিনি শুধু মুসলমান ও দলিতদের জন্য মঞ্চ গড়েছেন— সেই বিভাজনের রাজনীতির বীজ বপন। ভাগ্যিস হিন্দুরা নির্বোধ, আত্মবিস্মৃত জাত, নিজ রাষ্ট্রে নির্ণায়ক ভূমিকায় থাকার বুদ্ধিটাও তাদের নেই, তাই এরা করে খাচ্ছে।

আজ শুধু কংগ্রেস নয়, মেকি-কংগ্রেস-বিরোধী সিপিএম-তৃণমূল, এসপি, বিএসপি, আপ-কেও মাপ করা চলবে না। এরা সকলেই ইমামের নয়া স্ট্র্যাটেজির অংশীদার। এদের সকলকে বর্জন করুন। বিজেপি-র উচিত মমতার প্রতি মায়া ত্যাগ করা। উনি যেমন বিজেপি এবং নরেন্দ্র মোদীর প্রতি বিষোদগার করছেন, বিজেপি-র উচিত তার প্রত্যুত্তর দেওয়া। ভবিষ্যতে দরকার পড়লে ক্ষমতালোভীরা এমনিতেই আসবে, তোষামোদ করে নয়।

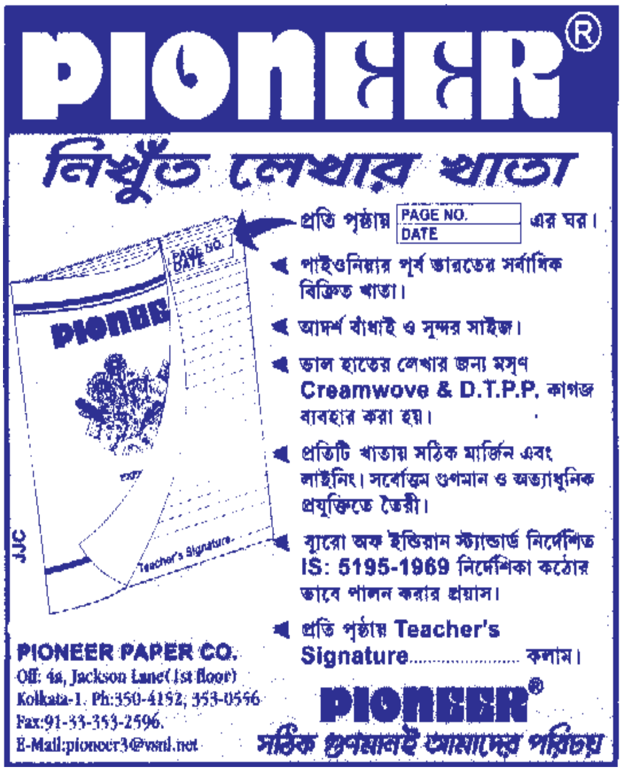

PIONEER®
নিখুঁত লেখার খাতা
প্রতি পৃষ্ঠায় PAGE NO. DATE এর ঘর।
পাইওনিয়ার পূর্ব ভারতের সর্বাধিক বিক্রিত খাতা।
আদর্শ বাঁধাই ও সুন্দর সাইজ।
ভাল হাতের লেখার জন্য মসৃণ Creamwove & D.T.P.P. কাগজ ব্যবহার করা হয়।
প্রতিটি খাতায় সঠিক মার্জিন এবং লাইনিং। সর্বোত্তম গুণমান ও অত্যাধুনিক প্রযুক্তিতে তৈরী।
ব্যুরো অফ ইন্ডিয়ান স্ট্যান্ডার্ড নির্দেশিত IS: 5195-1969 নির্দেশিকা কঠোর ভাবে পালন করার প্রয়াস।
প্রতি পৃষ্ঠায় Teacher's Signature.............. কলাম।
PIONEER PAPER CO.
Off: 4a, Jackson Lane (1st floor)
Kolkata-1. Ph:350-4152, 353-0556
Fax:91-33-353-2596.
E-Mail:pioneer3@vsnl.net
PIONEER®
সঠিক গুণমানই আমাদের পরিচয়

নেত্রদান মহাদান

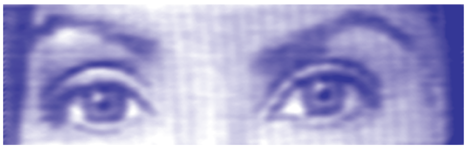

EYE BANK
23580201, 23341628, 23592931
Mobile - 9830333451
অনুসন্ধান ঃ 22181995, 22180387
সৌজন্যে ঃ কলাভারতী

# দেশ কি আই. এস. আই.-এর খপ্পরে?

**কল্যাণ ভঞ্জচৌধুরী**

দীর্ঘদিন ধরে ভারতে পাকিস্তানি গুপ্তচরসংস্থা আই. এস. আই-এর কাজ চলছে। এই সংস্থার কাজ হলো ভারতের ভিতরে অন্তর্ঘাত সৃষ্টি করে দেশের নিরাপত্তা বিঘ্নিত করা। বলাবাহুল্য এই কাজে তারা সাহায্য পেয়েছে দেশের এক বিরাট সংখ্যক মুসলমানদের যারা ভারতে পঞ্চম বাহিনী হিসেবে কাজ করে চলেছে। এরা ভারতে বসবাস করছে, কিন্তু ভারতকে 'শত্রুর দেশ' বলে মনে করে— আপন বলে ভাবে না। ভারতে আজ পর্যন্ত যতগুলি অন্তর্ঘাতমূলক কাজ হয়েছে— তার মূলে আছে আই এস আই। মজার কথা এদের অন্তর্ঘাতমূলক কাজ নিয়ে টুঁ শব্দ করেন না আমাদের দেশের এক শ্রেণীর হিন্দু রাজনীতিক ও বুদ্ধিজীবী। ফলে বিচ্ছিন্নতাবাদী মুসলমানদের পোয়াবারো। সম্প্রতি টিপুসুলতান মসজিদের শাহি ইমাম মৌলানা নুরুর রহমান বরকতি কয়েকটি পত্রিকার সঙ্গে সাক্ষাৎকরে ও একটি বিবৃতিতে নরেন্দ্র মোদীকে দেশের প্রধানমন্ত্রী নির্বাচিত করার বিরুদ্ধে মত প্রকাশ করেছেন। তাঁর মতে মোদী ক্ষমতায় এলে দেশে ধর্মনিরপেক্ষতা শেষ হয়ে যাবে। দেশ আর এস এসের হাতে চলে যাবে। দেশে গৃহযুদ্ধ বাঁধবে। শুধু তাই নয়, আফগানিস্তান পাকিস্তান ইরাকের মতো ভারতেও ইসলামি জেহাদিরা সক্রিয় হয়ে উঠবে। অতএব এই ভয়াবহ অবস্থা এড়াতে গেলে ধর্মনিরপেক্ষ সমস্ত রাজনৈতিক দলগুলিকে একত্র হয়ে মোদীর প্রধানমন্ত্রী হওয়া রুখতে হবে।

*টিপু সুলতান মসজিদের ইমাম বরকতিসাহেবের পাশে মমতা। (ফাইলচিত্র)*

টিপুসুলতান মসজিদের ইমামের এই বক্তব্য সবাইকে চমৎকৃত করবে। তিনি নিজে মুসলিম সাম্প্রদায়িকতার এক বড় স্তম্ভ। এবং তাঁর টিপুসুলতান মসজিদকে ঘিরে গড়ে উঠেছে হিন্দুবিরোধী চক্র। তাঁকে কোনোদিন মাদ্রাসা শিক্ষার বিরুদ্ধে মুসলিম জনমত তৈরি করতে দেখা যায়নি। উপরন্তু তিনি মাদ্রাসা শিক্ষা ব্যবস্থা সারা দেশে অক্টোপাশের মতো ছড়িয়ে দিচ্ছেন যার ফলে তৈরি হচ্ছে শয় শয় জেহাদি। দেশে সিমির মতো উগ্র মুসলমান দলগুলি সারা ভারতজুড়ে বিস্ফোরণ ঘটাচ্ছে। তাঁকে তো এর বিরোধিতা করতে দেখা যায়নি। দেশে হিন্দু মুসলমান সদ্‌ভাবনা তৈরির জন্য এতটুকু পদক্ষেপ নেননি। ঈদের সময় তিনি ও তাঁর মতো মুসলমানরা ইফতারের আয়োজন করেন যাতে হিন্দুরা দলে দলে যোগদান করেন। কই তাঁকে তো বিজয়া, দেওয়ালি বা হোলি উপলক্ষে হিন্দুদের উদ্দেশে কোনো বাণী দিতে দেখা যায়নি বা হিন্দুদের সঙ্গে অংশ নিতে মুসলমানদের আহ্বান জানাননি।

মোদি রাষ্ট্রক্ষমতায় এলে ভারত আফগানিস্তান, পাকিস্তান বা ইরাকের মতো ইসলামি জেহাদিদের রণাঙ্গন হবে বলে বরকতিসাহেব আশঙ্কা করেছেন। কিন্তু ভারতের অবস্থা আফগানিস্তান পাকিস্তান বা ইরাকের চেয়ে কি আলাদা?

আই এস আই ও ইসলামিক ডেভলপমেন্ট ব্যাঙ্কের কার্যকলাপের ফলে ভারত আজ আরেকটি পাকিস্তান ও আফগানিস্তান তৈরি হতে চলেছে। কই একবারও তো আই এস আই ও ইসলামিক ডেভলপমেন্ট ব্যাঙ্কের কার্যকলাপ নিয়ে দেশবাসীকে হুঁসিয়ারি দেননি? যদি অনুসন্ধানে দেখা যায় বরকতি সাহেব এঁদের সঙ্গে সহযোগিতা করে ভারতে অস্থিরতা তৈরি করতে সাহায্য করছেন তাতে আশ্চর্য হবার কিছু নেই। যিনি নিজে ষোল-আনা সাম্প্রদায়িক তাঁর পক্ষে সেক্যুলারিজমের বুলি হাস্যকর শোনায় না কি?

Design's For Modern Living
NEYCER
Neycer
NATIONAL PIPE & SANITARY STORES
Sales Office : 3, Jadu Nath Dey Road, Kolkata-12,
Ph. 2215-6804, Fax : 2212-2803
54, N. S. Road. Kolkata-700001. Ph. : 2210-5831 / 33

# বাংলাদেশি অনুপ্রবেশ ও পশ্চিমবঙ্গের রাজনৈতিক ও সামাজিক সঙ্কট

**বিমল প্রামাণিক**

১৯৭১ সালে বাংলাদেশের অভ্যুদয়ের পর ভারতের পূর্ব ও উত্তর-পূর্বাঞ্চলে একটি নতুন রাজনৈতিক ও সামাজিক প্রেক্ষাপটের উদ্ভব হয়। বাংলাদেশ থেকে আগত জনসংখ্যার একটা অভিনব চাপ সীমান্ত অঞ্চলগুলিতে ব্যাপক থেকে ব্যাপকতর আকার নিতে শুরু করে এবং ধর্মীয় জনবিন্যাসের পরিবর্তন হতে থাকে। এর ফলে একটা অভূতপূর্ব রাজনৈতিক ও সামাজিক পরিবেশ তৈরি হয়ে গেছে। বেশ কিছুদিন ধরে বিশ্লেষক ও সমালোচকগণ জনবিন্যাসের এই পরিবর্তনকে শুধুমাত্র অভিবাসনজনিত বলে মনে করতেন, কিন্তু পরবর্তী সময়ে এমন কতগুলি ঘটনা ঘটে যার ফলে বোঝা যায় এটা শুধুমাত্র অভিবাসন তো নয়ই বরঞ্চ নিরবচ্ছিন্ন অনুপ্রবেশ। এর পরিণতি হিসেবে এটাও বোঝা দরকার যে, জনবিন্যাসের এই নাটকীয় পরিবর্তনের ফলে সামাজিক সংহতি ও জাতীয় নিরাপত্তা বিঘ্নিত হওয়ার আশংকায় বিভিন্ন রাজনৈতিক দল ও নেতৃবর্গের মধ্যে চিন্তা ভাবনায় কী ধরনের পরিবর্তন এসেছে।

১৯৭১ সালের পূর্ববর্তী সময়ে পূর্বপাকিস্তান থেকে মুসলমান অনুপ্রবেশ নিয়ে তেমন কোনো উদ্বেগ দেখা যায়নি, কেননা, দলে দলে হিন্দুদের পাকিস্তান ছেড়ে-আসাকে দেশ বিভাগের অবশ্যম্ভাবী পরিণতি ধরে নিয়ে কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকারগুলি ব্যস্ত থাকেন। কিন্তু ১৯৭১ পরবর্তী বাংলাদেশ থেকে লাগাতার অনুপ্রবেশে তাঁরা নিরুদ্বেগ থাকছেন কি করে? এই লাগাতার অনুপ্রবেশের ফলে পূর্বভারতের সীমান্তবর্তী রাজ্যগুলি বিশেষ করে পশ্চিমবঙ্গ এবং অসমের ধর্মীয় জনবিন্যাসের উল্লেখযোগ্য নেতিবাচক পরিবর্তন ঘটে গেছে। আর এই পরিবর্তনের ফলে ওই সকল রাজ্যে রাজনৈতিক ও সামাজিক ক্ষেত্রে ভূমিপুত্রদের ক্ষমতাই শুধু খর্ব হয়নি, আরোও বড় বিপদ দেখা দিয়েছে। ইতিমধ্যেই এতদঞ্চলে এই কারণে উদার রাজনৈতিক সংস্কৃতি ও অভ্যন্তরীণ নিরাপত্তা হুমকির সম্মুখীন হয়েছে।

এখন ধর্মীয় জনবিন্যাস পরিবর্তনের বিপদ সামনেই দেখতে পাওয়া যাচ্ছে। জনসংখ্যা বৃদ্ধির ফলে পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভা আসনের পুনর্বিন্যাস হয়েছে এবং ২০১১ সালে সেই ভিত্তিতেই নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। দেখা যাচ্ছে, সীমান্তবর্তী দশটি জেলার মধ্যে আটটিতে ১৮টি আসন বেড়েছে। দার্জিলিং, দক্ষিণ দিনাজপুর, মালদায় ১টি করে বৃদ্ধি; উত্তর দিনাজপুর ও নদীয়া ২টি করে; মুর্শিদাবাদ ও দক্ষিণ ২৪ পরগণা ৩টি করে এবং উত্তর ২৪ পরগণায় ৫টি বৃদ্ধি পেয়েছে। গত ছয় দশকে (১৯৫১-২০১১) এই জেলাগুলিতে পূর্বপাকিস্তান এবং বাংলাদেশ থেকে ব্যাপক অনুপ্রবেশ ঘটেছে। বর্তমান বিধানসভায় (২০১১-২০১৫) নির্বাচিত ৫৯ জন মুসলমান এম এল এ-র ৪৪ জনই এসেছে সীমান্তবর্তী জেলাগুলি থেকে। যদিও গত বিধানসভায় (২০০৬-২০১১) এই সংখ্যা ১৪টি কম ছিল অর্থাৎ ৪৫ জন। বর্তমান বিধানসভায় উত্তর দিনাজপুর-৪, দক্ষিণ দিনাজপুর-১, মালদা-৬, মুর্শিদাবাদ-১৫, নদীয়া-৮, উত্তর ও দক্ষিণ ২৪ পরগণা ৫ জন করে মুসলিম বিধায়ক নির্বাচিত হয়েছেন। কিন্তু ভাগীরথী নদীর অন্য পাড়ে পুরুলিয়া ও পশ্চিম মেদিনীপুর ২টি; বাঁকুড়া, বর্ধমান, বীরভূম ও হুগলী জেলায় ১টি করে আর কলকাতায় ১০টি আসন হ্রাস পেয়েছে। এক নজরে এটা দেখা যাক: (সারণী-১ দ্রষ্টব্য)

পশ্চিমবঙ্গে এগারোটি লোকসভা আসনে ৩০ শতাংশের বেশি মুসলমান ভোটার রয়েছে। তারা যে কোনো প্রার্থীর জয়লাভের জন্য গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে। আসনগুলি উল্লেখ করছি,[১] রায়গঞ্জ (৪৭.৩৬%), মালদা উত্তর (৪৯.৭৩%), মালদা দক্ষিণ (৫৩.৪৬%), জঙ্গিপুর (৬৩.৬৭%), মুর্শিদাবাদ (৫৮.৩১%), বহরমপুর (৬৩.৬৭%), ডায়মন্ডহারবার (৩৩.২৪%), বীরভূম (৩৫.০৮%), যাদবপুর (৩৩.২৪%), জয়নগর (৩৩.২৪%), মথুরাপুর (৩৩.২৪%)। এছাড়া কয়েকটি আসন রয়েছে যেখানে মুসলমান ভোট একটা ভূমিকা রাখবে। ফলে এরাজ্যে রাজনৈতিক দলগুলির মধ্যে মুসলমান তোষণের এত প্রতিযোগিতা এবং মেকি ধর্মনিরপেক্ষতার এত ভড়ং। এই তথ্য মনোযোগ দিয়ে দেখলে ১৯৫০ সালে জওহরলাল নেহরুর মন্ত্রীসভা থেকে ড. শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের পদত্যাগের সময়ের মন্তব্য মনে পড়ে যায়। ১৯৫১-১৯৬১ সালের জনগণনায় দেখা গেল এক অসাধারণ মুসলিম জনসংখ্যায় বৃদ্ধি— যে বিষয়ে শ্যামাপ্রসাদ আগেই সতর্ক করেছিলেন। ওই দশকে পূর্বপাকিস্তান থেকে বিপুল পরিমাণ হিন্দু উদ্বাস্তুর পশ্চিমবঙ্গে আগমন সত্ত্বেও দেখা গেল তাদের বৃদ্ধি ৪১.৪২% আর মুসলমান জনসংখ্যার বৃদ্ধি ৪১.৮২%। সাধারণভাবে এত পরিমাণ বৃদ্ধি সম্ভব ছিল না যদি তারা পূর্বপাকিস্তান থেকে পুনরায় ভারতে ফিরে না আসতো। পশ্চিমবঙ্গে জনবিন্যাসের সবচেয়ে বড় বিপর্যয় ঘটেছে জ্যোতি বসুর আমলে (১৯৭৭-২০০০), এবং তিনিই রাজ্যে সবচেয়ে দীর্ঘ সময়কাল মুখ্যমন্ত্রী ছিলেন।

১৯৮১-১৯৯১ দশকে হিন্দু জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার পূর্বের দশকের চেয়ে কমেছিল উল্লেখযোগ্য হিন্দু উদ্বাস্তু বাংলাদেশ থেকে আসা সত্ত্বেও (হিন্দু উদ্বাস্তু আগমন কখনও থামেনি), কিন্তু মুসলমান বৃদ্ধির হার ৩৬.৮৯% ছিল বিস্ময়কর। যদি পশ্চিমবঙ্গে গবেষণার স্বাভাবিক পরিবেশ থাকতো তবে এই অস্বাভাবিক জনবৃদ্ধি একটি বড় বিতর্কের বিষয়, গবেষণার বিষয়, নির্বাচনী ইস্যু বা পরিকল্পনা ও পরিবেশের বিষয় হিসেবে স্থান পেতো। এ বিষয়ে সরকারি-সহ সব রাজনৈতিক মহল চুপচাপ, ২০১১ সালের জনগণনার তথ্যও চেপে রাখা হচ্ছে। ১৯৯১-২০০১ দশকে মুসলমান বৃদ্ধির হার কমলেও তা হিন্দুর চেয়ে প্রায় দ্বিগুণ। দেখা যাচ্ছে, ১৯৫১ সালে মুসলমান জনসংখ্যা ১৯.৮৫% থেকে ২০০১ সালে এসে দাঁড়িয়েছে ২৫.২৫% এবং ২০১১ সালে প্রায় ২৮%। এখন তৃণমূল, বামফ্রন্ট ও কংগ্রেস সবাই মুসলমান ভোট পেতে মরিয়া এবং তাদের তোষণের পদ্ধতিও নানারকম।

একটা বিষয় নজরে আসছে যে, পশ্চিমবঙ্গের কিছু অঞ্চলে দ্রুত মুসলমান ঘনবসতি অঞ্চল গড়ে উঠেছে। যেমন দিনাজপুর, মালদা, মুর্শিদাবাদ এবং বীরভূম। এই অঞ্চলে ১৯৫১ সালে হিন্দু ও মুসলমান জনসংখ্যা ছিল যথাক্রমে ৫৯% ও ৪০%; ২০০১ সালে এসে দাঁড়িয়েছে ৪৯.৯৪% ও ৪৯.৩১%। এই পাঁচ দশকে হিন্দু ও মুসলমান জনসংখ্যার বৃদ্ধির হার যথাক্রমে

### সারণি-১

**বিধানসভার আসন পুনর্বিন্যাস**

| ক্রমিক সংখ্যা | জেলার নাম | পূর্বের আসন সংখ্যা | বর্তমান আসন সংখ্যা | বেড়েছে | কমেছে |
|---|---|---|---|---|---|
| ১ | কোচবিহার | ৯ | ৯ | — | — |
| ২ | জলপাইগুড়ি | ১২ | ১২ | — | — |
| ৩ | দার্জিলিং | ৫ | ৬ | ১ | — |
| ৪ | উত্তর দিনাজপুর | ৭ | ৯ | ২ | — |
| ৫ | দক্ষিণ দিনাজপুর | ৫ | ৬ | ১ | — |
| ৬ | মালদা | ১১ | ১২ | ১ | — |
| ৭ | মুর্শিদাবাদ | ১৯ | ২২ | ৩ | — |
| ৮ | নদীয়া | ১৫ | ১৭ | ২ | — |
| ৯ | উত্তর ২৪ পরগণা | ২৮ | ৩৩ | ৫ | — |
| ১০ | দক্ষিণ ২৪ পরগণা | ২৮ | ৩১ | ৩ | — |
| ১১ | কলকাতা | ২১ | ১১ | — | ১০ |
| ১২ | হাওড়া | ১৬ | ১৬ | — | — |
| ১৩ | হুগলী | ১৯ | ১৮ | — | ১ |
| ১৪ | পূর্ব মেদিনীপুর | ১৬ | ১৬ | — | — |
| ১৫ | পশ্চিম মেদিনীপুর | ২১ | ১৯ | — | ২ |
| ১৬ | পুরুলিয়া | ১১ | ৯ | — | ২ |
| ১৭ | বাঁকুড়া | ১৩ | ১২ | — | ১ |
| ১৮ | বর্ধমান | ২৬ | ২৫ | — | ১ |
| ১৯ | বীরভূম | ১২ | ১১ | — | ১ |
|  | মোট | ২৯৪ | ২৯৪ | ১৮ | ১৮ |

২০৬% ও ৩৪২%। তাছাড়া, নদীয়া, উত্তর ও দক্ষিণ ২৪ পরগণা ও হাওড়ায় ছোট ছোট মুসলমান ঘনবসতি অঞ্চল গড়ে উঠেছে এই পাঁচ দশকে। সারা পশ্চিমবঙ্গে গত পাঁচ দশকের (১৯৫১-২০০১) হিন্দু ও মুসলমান বৃদ্ধির হার যথাক্রমে ১৯৮.৫৪% ও ৩১০.৯৩%। দেখা যাচ্ছে, ৭৮.৪৫% থেকে হিন্দু জনসংখ্যা কমে দাঁড়িয়েছে ৭২.৪৭% অর্থাৎ ৬% হ্রাস পেয়েছে। অন্যদিকে মুসলমান জনসংখ্যা ১৯.৮৫% থেকে বেড়ে দাঁড়িয়েছে ২৫.২৫% অর্থাৎ উক্ত সময়কালে ৫.৪০% বৃদ্ধি পেয়েছে। যদিও এই পাঁচ দশকে পূর্বপাকিস্তান ও বাংলাদেশ থেকে বিপুল সংখ্যক হিন্দু উদ্বাস্তু সেদেশে অত্যাচারিত হয়ে পশ্চিমবঙ্গে এসে আশ্রয় নিয়েছে। (সারণী-২ দ্রষ্টব্য)

পশ্চিমবঙ্গের জেলাগুলির গত পঞ্চাশ বছরের (১৯৫১-২০০১) হিন্দু-মুসলমান হ্রাস/বৃদ্ধির তথ্য থেকে দেখা যাচ্ছে যে, উত্তর ও দক্ষিণ দিনাজপুর, মালদা, মুর্শিদাবাদ, বীরভূম, দক্ষিণ ২৪ পরগণা, হাওড়া ও কলকাতায় মুসলমান জনসংখ্যার ব্যাপক বৃদ্ধি হয়েছে। এর ফলে লোকসভা ও বিধানসভা-সহ বিভিন্ন নির্বাচন মুসলমানদের আত্মবিশ্বাস যেমন বেড়েছে, তেমনই সমাজের মধ্যে নানা ইস্যুতে একটা আগ্রাসী মনোভাবের প্রকাশ পাচ্ছে। এতে পশ্চিমবঙ্গের সমাজে সাম্প্রদায়িক মনোভাবের বৃদ্ধি ঘটছে— যা ভারতীয় গণতন্ত্রের পক্ষে মোটেই সুখকর নয়।

পশ্চিমবঙ্গের জেলাগুলিতে বাংলাদেশি অনুপ্রবেশের ফলে নানাবিধ সমস্যা তৈরি হয়েছে। তারই দু'একটি সমস্যা নিয়ে পশ্চিমবঙ্গ সিপিআই-এর রাজ্য কমিটির পক্ষে গোবিন কাঁড়ার ১৯৯১ সালে তৎকালীন মুখ্যমন্ত্রী জ্যোতি বসু ও ভূমি ও ভূমিরাজস্ব মন্ত্রী বিনয় চৌধুরিকে একটি স্মারকলিপি দেন। তাতে বলা হয়েছিল, ‘‘মুখ্যমন্ত্রী তাঁর হোম সেক্রেটারি মারফত সম্ভবত অবগত আছেন যে, দলে দলে সীমান্তের ওপার থেকে অনুপ্রবেশকারীরা ওই রাজ্যে এসে নিয়মিতভাবে আইন-শৃঙ্খলার সমস্যা তৈরি করছে। আইনের ফাঁক-ফোকরের সুযোগ নিয়ে বাংলাদেশের বিত্তশালী লোকজন সীমান্ত অঞ্চলে সাধারণ মূল্যের দ্বিগুণ/তিনগুণ দাম দিয়ে জমি কিনে নিচ্ছে; এবং ওই জমি চাষ করার জন্য স্থানীয় কৃষি শ্রমিকদের বাদ দিয়ে বাংলাদেশ থেকে লোক নিয়ে এসে কৃষিকাজে নিয়োগ করা হচ্ছে। বালুরঘাট থানার খানপুরে গত বছর এই ঘটনা ঘটেছিল (বর্তমানে দক্ষিণ দিনাজপুর জেলা)। যখন স্থানীয় কৃষিশ্রমিকরা বাংলাদেশি মালিকের জমিতে ধান কাটার দাবি করে, তখনই আইন-শৃঙ্খলা সমস্যা তৈরি হয়ে যায়।...গত বছর জেলা প্রশাসনের হস্তক্ষেপে একটা সমঝোতায় পৌঁছানো গিয়েছিল, কিন্তু এবছর, পুনরায় বিরোধ তৈরি হয়েছে এবং জমি চাষকে কেন্দ্র করে সংঘর্ষের আশঙ্কা করা হচ্ছে। এই ধরনের ঘটনা ক্রমবর্ধমান। আইন করে বিদেশীদের এই রাজ্যে জমি ক্রয় বন্ধ করা উচিত এবং ইতিমধ্যে যে সকল জমি বিদেশীরা ক্রয় করেছে তাকে বে-আইনি ঘোষণা করা হোক। যে সকল বাংলাদেশিরা সীমান্ত অঞ্চলে এসে বেশ কিছুদিন বেআইনিভাবে বসবাস করছে তাদের গ্রেফতার করা হোক। আমরা আশা করি এবিষয়টি আপনি গুরুত্ব দিয়ে দেখবেন।’’[২]

ভারত সরকারের স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের রাষ্ট্রমন্ত্রী পি এম সাঈদ ১৯৯৫ সালে লোকসভায় এক প্রশ্নের উত্তরে বলেছিলেন, ‘‘ধর্মীয় ও অর্থনৈতিক কারণসহ নানা অজুহাতে বাংলাদেশি নাগরিকগণের ভারতে আগমন দীর্ঘদিন ধরেই চলে আসছে। এর ফলে সীমান্ত অঞ্চলের জনবিন্যাসের পরিবর্তন ঘটে গেছে এবং ওই অঞ্চলের পুরাতন বাসিন্দারা অনুপ্রবেশকারীদের চাপে দেশের আরো ভিতরে এসে আশ্রয় নিতে বাধ্য হচ্ছে। এছাড়াও দেখা যাচ্ছে, সীমান্তের উভয়পার্শ্ব জাতিগত, ভাষা ও সংস্কৃতিগত এবং ধর্মগতভাবে একই সম্প্রদায়ের দখলে চলে গেছে। ব্যাপক বাংলাদেশি মুসলমান অনুপ্রবেশই পশ্চিমবঙ্গ ও অন্যান্য সীমান্তরাজ্যগুলির মুসলমান জনসংখ্যা অতি বৃদ্ধির অন্যতম কারণ।’’[৩]

কিন্তু অতীব দুঃখের কারণ হচ্ছে, বামফ্রন্ট আমলে কোনো মুখ্যমন্ত্রীই না জ্যোতি বসু, না বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য কেউই এ বিষয়টি গুরুত্ব দিয়ে দেখেননি। বরঞ্চ তাদের ভোটব্যাঙ্ক হিসেবে ব্যবহার করেছেন। রাজনৈতিক পৃষ্ঠপোষকতা থাকার ফলে অনুপ্রবেশকারীরা তাদের কায়েমী স্বার্থরক্ষার জন্য প্রায় পুরো সীমান্ত অঞ্চলের প্রশাসনকে কাজে লাগাতে সমর্থ হয়েছে। এর ফলে দেখা যাচ্ছে, এককালের হিন্দু সংখ্যাগরিষ্ঠ গ্রামগুলি এখন মুসলমান সংখ্যাগরিষ্ঠ গ্রামে পরিণত হয়েছে। সীমান্ত অঞ্চলে হিন্দুদের উপর সাম্প্রদায়িক অত্যাচার, ডাকাতি ও নানা অসামাজিক কাজের ফলে হিন্দু সংখ্যা দ্রুত হ্রাস পাচ্ছে। অনুপ্রবেশ বা অন্য কোনো কারণে এই ব্যাপক জনসংখ্যাবৃদ্ধি একটা জন-আগ্রাসনের রূপ নিয়েছে। সীমান্ত অঞ্চলে ব্যাপক অনুপ্রবেশের ফলে এমন একটা রাজনৈতিক বাতাবরণ তৈরি হয়েছে যা মূলত একটা ভারত-বিরোধী মনোভাবকে উজ্জীবিত করছে।

কোচবিহার থেকে দক্ষিণ চব্বিশ পরগণা পর্যন্ত জনবিন্যাসের ব্যাপক পরিবর্তন ঘটে যাওয়ার ফলেই যে এই অবস্থার সৃষ্টি হয়েছে, তা বলাই বাহুল্য। এর ফলে, ভারতের সীমান্ত জনজীবনের ধারাটাই ক্রমশ অনিশ্চিত হয়ে পড়ছে। সীমান্ত অঞ্চলের রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক ব্যবস্থা এতই অপ্রতুল যে এটা বন্ধ করা প্রায় অসম্ভব। ধীরে ধীরে দেখা যাবে, ভারতের যে চিরন্তন রীতি-নীতি শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে বহমান, তা বদলে গিয়ে নব্য ইসলামি সংস্কৃতি ও জীবন ধারা এতদঞ্চলে প্রতিষ্ঠা লাভ করবে।

**তথ্যসূত্র :** ১. ইন্ডিয়া টুডে ১৮ মার্চ ২০১৪। ২. কালান্তর ২৬ আগস্ট ১৯৯১। ৩. আলোচিত প্রশ্ন ২৬৩৫, ১৭ আগস্ট ১৯৯৪ লোকসভা উত্তরকৃত।

*(লেখক : ডিরেক্টর সেন্টার ফর রিসার্চ ইন ইন্দো-বাংলাদেশ রিলেসনস্)*

## সারণি-২

### এক নজরে পশ্চিমবঙ্গের জনবিন্যাস পরিবর্তন ১৯৫১—২০০১ জনসংখ্যার অনুপাত (%)

| সময়কাল | | ১৯৫১ | ২০০১ | (%) পরিবর্তন |
|---|---|---|---|---|
| পশ্চিমবঙ্গ | হিন্দু | ৭৮.৪৫ | ৭২.৪৭ | — ৫.৯৮ |
| | মুসলমান | ১৯.৮৫ | ২৫.২৫ | + ৫.৪০ |
| দার্জিলিং | হিন্দু | ৮১.৭১ | ৭৬.৯২ | — ৪.৭৯ |
| | মুসলমান | ১.১৪ | ৫.৩১ | + ৪.১৭ |
| জলপাইগুড়ি | হিন্দু | ৮৪.১৮ | ৮৩.৩০ | — ০.৮৮ |
| | মুসলমান | ৯.৭৪ | ১০.৮৫ | + ১.১১ |
| কোচবিহার | হিন্দু | ৭০.৯০ | ৭৫.৫০ | + ৪.৪৬ |
| | মুসলমান | ২৮.৯৪ | ২৪.২৪ | — ৯.০৮ |
| উত্তর ও দক্ষিণ দিনাজপুর | হিন্দু | ৬৯.৩০ | ৬০.২২ | — ৯.০৮ |
| | মুসলমান | ২৯.৯৪ | ৩৮.৪৭ | + ৮.৫৩ |
| মালদা | হিন্দু | ৬২.৯২ | ৪৯.২৮ | — ১৩.৬৪ |
| | মুসলমান | ৩৬.৯৭ | ৪৯.৭২ | + ১২.৭৫ |
| মুর্শিদাবাদ | হিন্দু | ৪৪.৬০ | ৩৫.৯২ | — ৮.৬৮ |
| | মুসলমান | ৫৫.২৪ | ৬৩.৬৭ | + ৮.৪৩ |
| বীরভূম | হিন্দু | ৭২.৬০ | ৬৪.৬৯ | — ৭.৯১ |
| | মুসলমান | ২৬.৮৬ | ৩৫.০৮ | + ৮.৯১ |
| বর্ধমান | হিন্দু | ৮৩.৭৩ | ৭৮.৮৯ | — ৪.৮৪ |
| | মুসলমান | ১৫.৬০ | ১৯.৭৮ | + ৪.১৮ |
| নদীয়া | হিন্দু | ৭৭.০৩ | ৭৩.৭৫ | — ৩.২৮ |
| | মুসলমান | ২২.৩৬ | ২৫.৪১ | + ৩.০৫ |
| উত্তর * ২৪-পরগণা | হিন্দু | ৭৭.২৬ | ৭৫.২৩ | — ২.০৩ |
| | মুসলমান | ২২.৪৩ | ২৪.২২ | + ১.৭৯ |
| দক্ষিণ* ২৪-পরগণা | হিন্দু | ৭২.৯৬ (১৯৭১) | ৬৫.৮৬ | — ৭.১০ |
| | মুসলমান | ২৬.০৫ (১৯৭১) | ৩৩.২৪ | + ৭.১৯ |
| হুগলী | হিন্দু | ৮৬.৫২ | ৮৩.৬৩ | — ২.৮৯ |
| | মুসলমান | ১৩.২৭ | ১৫.১৪ | + ১.৮৭ |
| বাঁকুড়া | হিন্দু | ৯১.১৬ | ৮৪.৩৫ | — ৬.৮১ |
| | মুসলমান | ৪.৪০ | ৭.৫১ | + ৩.১১ |
| পুরুলিয়া* | হিন্দু | ৯৩.১৩ (১৯৬১) | ৮৩.৪২ | — ৯.৭১ |
| | মুসলমান | ৫.৯৯ (১৯৬১) | ৭.৬২ | + ১.১৩ |
| মেদিনীপুর | হিন্দু | ৯১.৭৮ | ৮৫.৫৮ | — ৬.২০ |
| | মুসলমান | ৭.১৭ | ১১.৩৩ | + ৪.১৬ |
| হাওড়া | হিন্দু | ৮৩.৪৫ | ৭৪.৯৮ | — ৮.৪৭ |
| | মুসলমান | ১৬.২২ | ২৪.৪৪ | + ৮.২২ |
| কলকাতা | হিন্দু | ৮৩.৪১ | ৭৭.৬৮ | — ৫.৭১ |
| | মুসলমান | ১২.০০ | ২০.২৭ | + ৮.২৭ |

উৎস : ভারতের জনগণনা, ২০০১

* বিন্যাসকৃত তথ্য

# নরেন্দ্র মোদীকেই প্রধানমন্ত্রী হিসাবে দেখতে চাই

**ভূপেশ দাস**

ভারতবর্ষ যখন তিন টুকরো হয়ে স্বাধীনতা লাভ করল তখন আমি পূর্ববাংলার এক কলেজের আই-এ ক্লাসের ছাত্র। আমাদের ভবিষ্যৎ হঠাৎ অন্ধকারে ঢেকে গেল। গ্রামের জমি-বাড়িতে আমাদের কোনো অধিকার নেই। সেইসব প্রাণের বস্তু ছেড়ে চলে আসতে হলো পশ্চিমবঙ্গে। কোথায় থাকবো, কোথায় খাবো তার কোনো হদিশ নেই। চূড়ান্ত দিশেহারা অবস্থা আমাদের। অতি কষ্টে যো-সো করে একটা চাকরি যোগাড় করা গেল। কলকাতার উপকণ্ঠে কোনো মতে কম ভাড়ায় মাথা গোঁজার একটা আশ্রয় জুটল। এরকম অবস্থায় শুধু আমিই নই, আরো লক্ষ লক্ষ পূর্ববঙ্গবাসী হিন্দু এই দুর্দশায় হাবুডুবু খাচ্ছে। রাতের কলেজে পড়াশোনা চালিয়ে যেতে লাগলাম। আমাদের মাননীয় রাজনৈতিক নেতারা আশ্বাস দিলেন— সবকিছু ঠিক হয়ে যাবে। পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা হচ্ছে। আমরাও আশায় বুক বাঁধলাম। নেতারা বলতে লাগলেন--- ‘ভারত আবার জগতসভায় শ্রেষ্ঠ আসন লবে’।

তারপর থেকে অনেকগুলো বছর পেরিয়ে যেতে লাগলো। আমরা এবং আমাদের মতো অনেক আশাবাদী মানুষ— যারা সুদিনের স্বপ্ন দেখতে অভ্যস্ত ছিলাম— দেখলাম, এবং দেখতেই থাকলাম--- আমাদের সাধারণ মানুষের আশা-আকাঙ্ক্ষার বৃত্ত যেন ক্রমশই ছোট হয়ে আসছে। তবু, আজ এ চুরাশি বছর বয়সেও আমি বিশ্বাস করি— ভারতবর্ষের সুদিন আসবেই। বৃটেনের বিখ্যাত পণ্ডিত স্যামুয়েল জনসনের একটি উক্তি বারবার মনে পড়ে। তিনি বলতেন— ‘রাজনীতি হচ্ছে স্কাউন্ড্রেলদের শেষ আশ্রয়’। কথাটা যে কতখানি সত্যি তা গত পঞ্চাশ/ষাট বছরের রাজনীতির হাল দেখলেই বোঝা যায়। বিশ্ব-রাজনীতির ক্ষেত্রে ভারত ক্রমশ পিছিয়েই যাচ্ছে। দুর্বল ভারতবর্ষকে কেউ পৌঁছে না। ভারতের চারদিকের প্রতিবেশী রাষ্ট্রগুলো ভারতকে খুঁচিয়েই যাচ্ছে। কাপুরুষ অথচ স্বার্থান্বেষী কুটিলচিত্ত ভারতীয় রাজনীতিবিদরা নিজেদের ধান্দা নিয়েই ব্যস্ত। এদের একমাত্র লক্ষ্য— সমস্ত সুযোগসুবিধা ভোগ করা এবং কোটি কোটি টাকা আত্মসাৎ করা। ভণ্ডামি এবং দ্বিচারিতা দীর্ঘদিন ধরে সুপরিকল্পিতভাবে চলে আসছে। দুর্নীতি ও দলবাজি হাত ধরাধরি করে চলছে।

দল ছাড়া শাসন চালানো যাবে না— এই রকমই নাকি নির্দেশ ভারতীয় সংবিধানের। প্রচুর দলের উত্থানপতন দেখলাম। দল মানেই দলাদলি, দল মানেই অনন্ত সুযোগসুবিধা পাবার এবং আদায়ের পাসপোর্ট। দল মানেই দল বেঁধে লুটপাঠ। কোনো দলই তো ভারতবর্ষকে সুখসমৃদ্ধি দিতে ও শক্তিধর করতে পারলো না। তাছাড়া দলগুলো হয়ে উঠেছে ব্যক্তিকেন্দ্রিক বা পারিবারিক একনায়কত্বের পোষক ও ধারক মাত্র। অথচ আমাদের মতো সাধারণ ভারতবাসীর--- যারা কোনো দলকেই মনেপ্রাণে বিশ্বাস করে না, কিন্তু ভোট না দিয়েও থাকতে পারে না— তাদের সামনে কোনো আশা-ভরসার আদর্শের প্রতিরূপ নেই।

এই রকমই যখন দেশের অবস্থা তখন নতুন কাউকে ভোট দিয়ে দেখাই যাক না, আমাদের নিম্নমুখী অবস্থার কোনো পরিবর্তন হয় কিনা।

স্বামী বিবেকানন্দের একটি বিখ্যাত বাণী মনে পড়ছে বেশী করে— ‘চালাকির দ্বারা মহৎ কার্য হয় না।’ আমরা কিছু ব্যক্তি দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি, ভারতবর্ষকে বর্তমান অবস্থা থেকে বাঁচাতে পারে একমাত্র বিবেকানন্দজীর ভাবধারার অনুসরণ। স্বামীজীর কিছু ভবিষ্যদ্বাণী বর্ণে বর্ণে ফলে গেছে; যেমন তিনি বলেছিলেন ১৮৯৭ খৃস্টাব্দে— ‘‘আগামী পঞ্চাশ বছরের মধ্যে অভাবনীয় ভাবে বিনা রক্তপাতে ভারতবর্ষ স্বাধীনতা লাভ করবে এবং স্বাধীনতা লাভের পর চীনের দ্বারা ভারতবর্ষ আক্রান্ত হবে।’’ আরো বলেছিলেন--- ‘‘পৃথিবীতে শূদ্র জাগরণ আসছে। সে জাগরণ প্রথমে ঘটবে রাশিয়ায় এবং তারপর চীনে। তারপর পালা ভারতবর্ষের।’’

ক্রান্তদর্শী সাধুর বাক্য মিথ্যা হবার নয়। তিনি আরো বলেছিলেন, ‘‘ভারত স্বাধীনতা লাভের পর পঞ্চাশ বছর খুব নীচে নেমে যাবে, তারপরে ভারতের উন্নতি হবে। ভারত আবার জগতে শ্রেষ্ঠ হবে।’’

আমি মনে-প্রাণে বিবেকানন্দের উপর বিশ্বাস রাখি। বর্তমান পরিস্থিতিতে আমি তাই তাঁকে অনুসরণ করতে চাই যিনি স্বামী বিবেকানন্দের ভাবধারার অনুসারী হবেন এবং সেই মতো কাজ করার চেষ্টা করবেন। নরেন্দ্র মোদীর মধ্যে আমি সেই সম্ভাবনা দেখি। তাই আমি ভারতবর্ষের পরবর্তী প্রধানমন্ত্রী হিসাবে নরেন্দ্র মোদীকেই দেখতে চাই। রাজনীতিবিদদের মতে কূট যুক্তিতর্কের সাহায্য আমি এই সিদ্ধান্তে উপনীত হচ্ছি না। উপরি-উক্ত কথাগুলো আমার ব্যক্তিগত বিশ্বাস ও আত্মগত ধারণা।

*(লেখক : একজন চিকিৎসক)*

# চৈতি উৎসব রামকথা

**নবকুমার ভট্টাচার্য**

এদেশের জনমানস রামনামের গভীর ভাবভক্তিতে আচ্ছন্ন হয়। রামনামের এমনই রসধারা, লীলা, ঐতিহ্য যা সর্বস্তরের মানুষকে নাড়া দেয়। রামকাহিনীকে কেন্দ্র করে এদেশে শিল্প-সঙ্গীত-সাহিত্য গড়ে ওঠে। গৃহমন্দির থেকে শুরু করে লোকালয়ে পথে পথে কথা, কথকতায়, গান অভিনয়ে শিল্প মহিমায় প্রবাহিত হয় রামনামের ধারা।

রামকাহিনীর কথাগান লব ও কুশই প্রথম করেছিলেন। রামকথা চিরকালীন। এর শাশ্বতরূপের জন্য মানুষের কাছে এর আকর্ষণ চিরন্তন। এই ঐতিহ্য পরম্পরার প্রতিফলন মন্দিরগাত্রে, নৃত্য গীত ও সাহিত্যে রয়েছে। রামকথার মধ্যে এমনসব চরিত্রের সমাবেশ হয়েছে যাদের চরিত্রাদর্শ, সাহস ও উদ্দীপনা-বীরত্ব ত্যাগের মহিমা, নিষ্ঠা, ভক্তি, সেসব সর্বত্র সর্বকালের মানুষের কাছে অনুকরণযোগ্য। রামলীলা কাহিনী শুধু এদেশেই নয় ইন্দোনেশিয়া, থাইল্যান্ড, কাম্পুচিয়া, চীন, জাপান, শ্রীলঙ্কা প্রভৃতি দেশেও প্রচলিত ও জনপ্রিয়।

রামলীলা অভিনয় যেন চিত্ররূপ। সঙ্গীত, সংলাপ, আবৃত্তি ও অভিনয়ের মাধ্যমে রামের জীবনবৃত্তান্ত অনুষ্ঠিত হয়। এই অভিনয় হয় উত্তর ভারত ও পূর্ব ভারত জুড়ে। গ্রাম শহর মন্দির প্রাঙ্গণে অনুষ্ঠিত হয় এই রামলীলা। ওড়িশার কেশব পট্টনায়কের ‘নটরামায়ণ’, তেলুগুতে ‘রঙ্গনাথরামায়ণ’ ‘কেরলের ‘অধ্যাত্মরামায়ণ’ তামিল ভাষায় ‘কম্বন রামায়ণ’ প্রভৃতি গ্রন্থের কাহিনীর নানারূপ লক্ষ্য করা যায়। আবার গাথা গায়কদের দ্বারা বিভিন্ন সময়ে তা পরিবর্তিত হয়েছে। বাংলায় কৃত্তিবাসী রামায়ণের কদর রয়েছে। গাথা গায়করা তা অনুসরণ করেন। তবে বাল্মীকি রামায়ণের পরই তুলসীদাসের ‘রামচরিত মানস’ এর স্থান। ষোড়শ শতকের এই কাহিনী ভারতে অধিক জনপ্রিয়। ‘রামচরিত মানস’ মূলত সঙ্গীতপ্রধান। ১৬২৫ সালে বারাণসীতে প্রথম রামচরিত মানস মঞ্চস্থ হয়। এতে ব্রাহ্মণ কিশোরদেরই নিয়োজিত করা হয়। একথা ঠিক যে, রাম-কথা লীলা তুলসীদাসের অজানা ছিল না। একদা বেশ আদরণীয়ই ছিল। প্রসঙ্গত তুলসীদাস রামায়ণী লীলা কাণ্ড নবতমরূপে সাজিয়েছিলেন নিবেদনের মহার্ঘতায়। তুলসীদাসের মৃত্যুর পর তাঁর পরমভক্ত ভক্তরামদাস কিছু সংযোজন করেন।

রামলীলা অভিনয় স্থলে বসেন কথাকার। একটা উঁচু চৌকিতে। সকলে তাঁকে দেখতে পান আর তিনিও সব কিছু দেখেন। শুরু হয় কথা গান ও সংলাপ। বেজে ওঠে ঢোলক বাঁশি বেহালা। সভাস্থলের চতুর্দিকে দর্শক। অভিনেতারা অবশ্য মঞ্চের ওপরই বসেন। কথাকার তাঁর কথা গায়ন থামালে শুরু হয় অভিনয়। কথাকার যে জীবনকথার আভাস দেন তা অভিনয়ের মাধ্যমে জীবন্ত হয়ে ওঠে।

আগে রামলীলার জন্য অভিনেতা সংগ্রহ করা হোত ব্রাহ্মণ পরিবার থেকে। সাধারণত চোদ্দো বছরের নীচে। মনে করা হোত দেবতার ভূমিকায় উচ্চবর্ণ নেওয়াই শ্রেয়। এখন সবসময় তা অনুসরণ করা হয় না। অভিনয়ের দক্ষতা, সঙ্গীতপ্রিয়তা ও নিষ্কলুষ চরিত্রের অধিকারীদের সুযোগ দেওয়া হয়। রাম লক্ষ্মণ সীতার অভিনয়ের জন্য তিন চার বছর অন্তর অভিনেতা পরিবর্তন হয়। উল্লেখ্য সীতার ভূমিকায় এখন কিশোরীদের নির্বাচন করা হচ্ছে। বাছাই পর্ব শেষ হলে শিল্পীরা মানসিকভাবে তৈরি হতে থাকে। দৈব চরিত্র ভূমিকার জন্য আচার সংযম ও নিষ্ঠা পালন করতে হয়। কাশীতে রামলীলায় মূলত চারটি ভাগে নাটক হয়ে থাকে। শুরু হয় রামের জন্মকথা দিয়ে। প্রথম ভাগে অযোধ্যার রাজপ্রসাদ। দ্বিতীয় ভাগে কিষ্কিন্ধ্যার অরণ্য, তৃতীয় ভাগে লঙ্কাপর্ব এবং চতুর্থ ভাগে মিথিলা। গোটা সমাজ এই অভিনয় দ্বারা আচ্ছন্ন হয়, আপ্লুত হয়।

রামকথা বা রামলীলা নাটকের প্রসঙ্গে বারাণসী ও কাশীর রামনগরের রামায়ণলীলা বিশেষ উল্লেখযোগ্য। রামনবমীতে এই লীলা স্থানবিশেষ পার্থক্য রয়েছে। গুজরাট, রাজস্থান ও বুন্দেলখণ্ডেও খুব জাঁকজমক। রামনগরের মহারাজার প্রত্যক্ষ পৃষ্ঠপোষকতায় এক সময় এর জৌলুস ও মহিমা স্বতন্ত্র ছিল। লীলা নাটকের সময় মহারাজ পুরো পরিবারবর্গ নিয়ে উপস্থিত থাকতেন। উৎসবের কোনও ত্রুটি সহ্য করতে পারতেন না। রামলীলা শুভারম্ভে

মহারাজ রাম, লক্ষ্মণ ও সীতার আরতি করে নিতেন। একদা রাজার এস্টেটে স্বতন্ত্র বিভাগ ছিল। মন্ত্রী উপমন্ত্রী এ বিষয়ে দেখভাল করতেন। সে আড়ম্বর আজ না থাকলেও রামলীলা হয়। উত্তর ভারত জুড়েই হয়। সেকালের জৌলুস না থাকলেও উৎসবের আড়ম্বরের খামতি নেই। বুন্দেলখণ্ড অঞ্চলে রামলীলা মঞ্চ হয় বিশেষ ধরনের। উন্মুক্ত পরিবেশ খোলা প্রান্তরে দুদিকে দুটি মঞ্চ তৈরি হয়। একদিকে অযোধ্যা, অন্য প্রান্তে লঙ্কা মধ্যবর্তী স্থানটি লীলাক্ষেত্র। কানপুরে এই লীলায় চারটি মঞ্চ তৈরি হয়। রাজস্থানের ভরতপুরের রামলীলার খ্যাতি রয়েছে। কানপুরের অনুকৃতি সংস্থা বহু বছর ধরে রামলীলা নাটক মঞ্চস্থ করে চলেছে।

উত্তর ভারতে রামলীলা নাটকের যে রূপবৈচিত্র্য তা তুলসীদাসের রামচরিত মানসকে উপজীব্য করে রূপায়িত। লবকুশের রামায়ণ গানের কথা বাল্মীকির রামায়ণে রয়েছে। হরিবংশ পুরাণেও রামকাহিনী বিষয়ক নাট্যাভিনয়ের কথা উল্লেখ আছে। উনিশ শতকে বেশ কয়েকটি নাটক লেখা হয়েছে রামকথাবিষয়ক। দেবকীনন্দন ত্রিপাঠীর 'সীতাস্বয়ম্বর', মধুকরের 'রামলীলা বিহার' ও দামোদর শাস্ত্রীর 'রামলীলা' অন্যতম।

মনে রাখতে হবে বাংলা এবং ওড়িশায় যাত্রাপালা শুরু হয়েছিল রামায়ণ ও রামকাহিনী নির্ভর করে।

ভ্রমণ পিপাসু বাঙালীর নির্ভরযোগ্য সঙ্গী
Sharada Travels
শারদা ট্রাভেলস্
ফুলেশ্বর, উলুবেড়িয়া, হাওড়া
প্রত্যুষ মন্ডল — 9874398337

গ্রীষ্মকালীন ভ্রমণ সূচী ২০১৪

| ভ্রমণ | মূখ্য দর্শনীয় স্থান | দিন | শুভ যাত্রা | প্যাকেজ মূল্য |
|---|---|---|---|---|
| কাশ্মীর | জম্মু, শ্রীনগর, গুলমার্গ, সোনমার্গ, পহেলগাঁও, বৈষ্ণোদেবী | ১৩ | ১৭ই মে | ১৪,৫০০/- |
| দার্জিলিং | টাইগার হিল, ঘুম মনেস্ট্রী, বাতাসী, মিরিক | ৬ | ৩০শে মে | ৬,০০০/- |
| সিমলা | সিমলা, কুফরি, মানালী, রোটাংপাস, কুলু, মনিকরন | ১১ | ১৮ই মে | ১১,২০০/- |
| হরিদ্বার | হরিদ্বার-হৃষিকেশ, লক্ষ্মনঝোলা, দেরাদুন, মুসৌরী | ৮ | ২৭শে মে | ৬,২০০/- |

ট্রেনের টিকিট নিশ্চিত করতে অবশ্যই যাত্রা শুরুর তিন মাস আগে যোগাযোগ করুন অথবা ডাকুন।

**প্যাকেজে থাকছে :-** ট্রেনে (স্লিপার ক্লাস), বড়/ছোট গাড়ীতে যাতায়াত, সাইড সিইং, সকালে চা টিফিন, লাঞ্চ,ডিনার (আমিষ/নিরামিষ),টোল ট্যাক্স,গাড়ী পার্কিং, ফ্যামেলি অনুযায়ী রুম।

**প্যাকেজে থাকছে না :-** ট্রেন চলাকালীন কোন রকম খাবার, এন্ট্রি ফি, কুলী ভাড়া,ক্যামেরা চার্জ, নৌকাবিহার, রোপওয়ে,হাতি/ঘোড়া চাপা, পুজো দেওয়া, ব্যক্তিগত ব্যবহারের গাড়ি ভাড়া।

স্কুল, কলেজ ও গ্রুপ টুরের জন্য যোগাযোগ করুন।

✷ ভ্রমণ শুরু ও শেষ, হাওড়া/শিয়ালদহ/ কোলকাতা অথবা উল্লেখ্য নির্দিষ্ট কোন স্থান থেকে ✷ হঠাৎ করে যানবাহনের ভাড়া বৃদ্ধি অথবা ভ্রমণ সম্পর্কিত বিষয়ে মূল্যবৃদ্ধি ঘটলে প্যাকেজ মূল্য বর্ধিত হবে। ✷ বালক / বালিকাদের ক্ষেত্রে (৫-১১ বৎসর) প্যাকেজ মূল্যের ৭৫% টাকা লাগবে। শিশুদের ক্ষেত্রে (২-৪ বৎসর) প্যাকেজ মূল্যের ২৫% টাকা লাগবে।

# মন্দিরময় অযোধ্যা

**ড. প্রণব রায়**

ভারতের প্রাচীন নগরগুলির মধ্যে অযোধ্যা একটি পবিত্র নগরী ও তীর্থস্থানরূপে সুপ্রাচীনকাল থেকে পরিচিত। শ্রীরামচন্দ্রের জন্মভূমি ও রাজ্য ছিল এই অযোধ্যায়। নগরীর পূর্ব, পশ্চিম ও দক্ষিণ দিক দিয়ে বয়ে চলেছে পবিত্র সলিলা সরযূ। সরযূর তীরে গড়ে উঠেছিল একে একে উচ্চ শিখর দেবদেউল। দূর থেকে এটিকে একটি মন্দিরনগরী বলে মনে হয়। অযোধ্যার অলিতে-গলিতে রামচন্দ্রের মন্দির, ঠাকুরবাড়ি, ছাউনি। সব সময় হরিনাম ও রামনামে মুখর এই নগরী। ভারতের আর কোথাও এমনটা দেখা যায় না।

অযোধ্যায় এত মন্দির আছে, যে তার সংখ্যা গণনায় শেষ করা যায় না। বহু প্রাচীন মন্দিরও আছে এখানে। মন্দিরগুলির বেশির ভাগই ঠাকুরবাড়ির মতো অর্থাৎ চারপাশ ঘেরা একটি বাড়ি। সামনে 'দেউড়ি' বা প্রবেশদ্বার। দেউড়ি দিয়ে ঢুকেই দু'পাশে দুটি ছোট ঘর। এরপর চত্বর বা প্রাঙ্গন। চত্বর অতিক্রম করে সামনে দর্শক মণ্ডপ ও তারপরে গর্ভগৃহ। এখানে দেববিগ্রহের অধিষ্ঠান। চত্বরের চারদিকে দ্বিতল চকলিমান, যেমন আমরা কলকাতার পুরনো বনেদী পরিবারের বাড়িগুলোয় দেখি বা বিভিন্ন দুর্গাদালানে লক্ষ্য করি। যে কোনো প্রাচীন ধনী পরিবারের বাড়ি ও ঠাকুরবাড়ি এই পদ্ধতিতেই তৈরি হয়েছিল। 'চকমিলান' বাড়ির দ্বিতল থেকে 'দালান' বা মণ্ডপের ঠাকুর দর্শন করা যেত সেকালে।

অযোধ্যায় পুরনো মন্দিরগুলোর প্রায় সবগুলিই এই পদ্ধতিতে তৈরি। কিন্তু এইসব ঠাকুরবাড়ির বেশি ভাগেরই প্রতিষ্ঠাকাল জানা যায়নি। কতকগুলো মন্দির অবশ্য সাম্প্রতিক কালের।

অযোধ্যায় প্রসিদ্ধ মন্দিরগুলি হল 'হনুমানগড়ি', 'কনকভবন মহল্লা'য় কনকজীর মন্দির, বাল্মীকির রামায়ণ ভবন, চারধাম, মণিরামদাসজী মহারাজের ছাউনি, শ্রীরামজানকী ভবন, সরযূ নদীতীরবর্তী রামকা পৌড়ি, ভোজব্রহ্মপুর প্রভৃতি।

'হনুমানগড়ি' অযোধ্যার সর্বাপেক্ষা প্রসিদ্ধ মন্দির। প্রতিদিন অসংখ্যা তীর্থযাত্রী এখানে আসেন। সমতল স্থান থেকে এই মন্দির অনেক উচ্চে অবস্থিত। অনেকগুলো সিঁড়ি দিয়ে ওপরে উঠে একটি প্রশস্ত চত্বরে প্রবেশ করা যায়। হনুমানজীর মূল মন্দির খুব একটা উচ্চ নয়। গর্ভগৃহে হনুমানজীর মূর্তি বর্তমান। মূল মন্দিরের চারদিকে চত্বর। চত্বরের চারদিকে সারি সারি কক্ষ। সেখানে অনেক দেববিগ্রহ অধিষ্ঠিত আছেন। মন্দিরটি উত্তরমুখী হলেও চত্বর অতিক্রম করে দক্ষিণদিকে আবার অনেক সিঁড়ি দিয়ে নিচে আসা যায়। হনুমানজীর অপর একটি পুরনো মন্দির উচ্চ শিখরযুক্ত। বাইরে উত্তরদিকের সিঁড়ি দিয়ে নেমে ওই মন্দিরে আসা যায়। হনুমানজীর প্রিয় ভোগ পেড়া ও লাড্ডু। পাশে বহু দোকান আছে। এই মন্দিরগুলি কত পুরনো বলা কঠিন। মন্দিরে অনেকবার সংস্কারের প্রলেপ পড়েছে।

হনুমানগড়ি থেকে আরও উত্তরদিকে গেলে পড়বে এখানকার প্রসিদ্ধ কনকজীর মন্দির। এটিও একটি ঠাকুরবাড়ি। খুবই ঐশ্বর্যময়। দেউড়ি পেরিয়ে প্রশস্ত চত্বর। সিঁড়ি দিয়ে উঠে দর্শক মণ্ডপ ওপারে গর্ভগৃহ। গর্ভগৃহে রামসীতা সহ বহু দেববিগ্রহ বর্তমান। গর্ভগৃহ মন্দিরের শিখর উচ্চ। শীর্ষদেশের কলস সুবর্ণতুল্য। দর্শকমণ্ডপের দেওয়ালের উপরিভাগে কোনো কোনো রাজা মহারাজার তৈলচিত্র টাঙানো আছে। এই ঠাকুরবাড়ি খুবই সুন্দর ও ছিমছাম। এটিকে স্থানীয়ভাবে শ্রীরামচন্দ্রের 'সভাগৃহ'ও বলা হয়। এখানে ভজনসঙ্গীত প্রভৃতি প্রায়ই হয়।

কাছাকাছি একটি প্রসিদ্ধ ঠাকুরবাড়ির নাম 'চারধাম' এবং তার কাছে শ্রীস্বামী মণিরামদাসজী মহারাজজীর 'ছাউনি' (আখড়া) অযোধ্যার খুবই উল্লেখযোগ্য দেবালয়। 'চারধাম' বলার উদ্দেশ্য, এখানে গর্ভগৃহের এক একটি কক্ষে শ্রীবদ্রীনারায়ণ, শ্রীজগন্নাথ-সুভদ্রা- বলরাম, শ্রীদ্বারিকাধীশ এবং শ্রীরামেশ্বর বিগ্রহ পূজিত হন। এজন্যই একে 'চারধাম' বলা হয়।

মন্দির গর্ভগৃহের পেছনে আছে একটি বড় 'পঙ্গতশালা'। অসংখ্য ভক্ত এখানে প্রসাদ গ্রহণ করেন। পঙ্গতশালার পাশেই বিশাল খাদ্যভাণ্ডার। এক বাবাজী সেখানে থাকেন। মুর্শিদাবাদের (মুকসুদাবাদ, পশ্চিমবঙ্গ) কোনো মঠের সঙ্গে এই মঠের যোগাযোগ আছে বলে জানা যায়। এর কিছু দূরে 'ভোজব্রহ্মপুর' নামে একটি বেশ প্রাচীন মঠ আছে। কিন্তু মঠটির জীর্ণদশা লক্ষ্য করা যায়। এটিও একটি ছোট্ট ঠাকুরবাড়ি এবং পূর্বোক্ত পদ্ধতিতে নির্মিত। গোরক্ষপুরের কোনো ব্যক্তি এটি তৈরি করেন বলে জানা যায়। এখনও এটি গোরক্ষপুর মোহান্তের দ্বারা পরিচালিত। এটি একটি সীতারাম মন্দির।

এরই পাশে সুদৃশ্য 'বাল্মীকীয় রামায়ণ ভবন'। এটি একটি উচ্চ চাকচিক্যময় দেবালয়। সিঁড়ি দিয়ে উঠে প্রবেশদ্বার দিয়ে ভেতরে ঢাকা 'চবুতর' বা চত্বর। সবই মার্বেল পাথরে তৈরি। শান্ত স্নিগ্ধ ও পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন। গর্ভগৃহে মার্বেল পাথরে তৈরি মহর্ষি বাল্মীকিদেবের শ্মশ্রুগুম্ফমণ্ডিত সৌম্য দণ্ডায়মান মূর্তি। তার দুপাশে লব ও

কুশ। সম্পূর্ণ বাল্মীকি রামায়ণের শ্লোক দেওয়ালগাত্রে খোদিত। রাল্মীকীয় ভবনের উচ্চ শিখর দূর থেকে দেখা যায়। এটি অযোধ্যার একটি অবশ্য দর্শনীয় মন্দির।

অযোধ্যায় বেশ কিছু ঠাকুরবাড়ি আছে, যেগুলো বেশ পুরনো এবং জীর্ণ। সব ঠাকুরবাড়িরই নির্মাণ পদ্ধতি এক। প্রথমে প্রবেশদ্বার, এর দুপাশে কক্ষ। এর পর প্রাঙ্গণ। পরে দর্শক মণ্ডপ ও গর্ভগৃহ। এমন একটি ছোট্ট ঠাকুরবাড়ি 'শ্রী সম্প্রদায়ের (রামানুজ সম্প্রদায়) ঠাকুরবাড়ি। বাল্মীকীয় ভবন থেকে কিছুটা হেঁটে উত্তরদিকে গেলে ডানদিকে এই ঠাকুরবাড়ি দেখা যাবে। এঁদের প্রতীক 'কনকমঞ্জুরী' নূপুরচিহ্ন। এখান থেকে আরও কিছুটা উত্তরে গেলে 'শ্রীরামজানকী ভবন'। এটিও একটি বিশাল দেবালয়। দেবালয়টির উচ্চ 'শিখর' অনেক দূর থেকে দেখা যায়।

আরও এগিয়ে পুবে সরযূ নদীর ধারে সারি সারি বহু মন্দির। নদীতীরে নগরীর কোল ঘেঁষে মন্দিরগুলিকে ওপার থেকে ভারী সুন্দর দেখায়। মন্দিরগুলোর চূড়া বেশ উচ্চ। যেন স্বর্গপুরীর মতো দেখায়।

'রাম কা পৌড়ি' অঞ্চলে নগরীর অন্তর্ভুক্ত 'নাগেশ্বরনাথ' জীউর মন্দির খুব উল্লেখযোগ্য একটি মন্দির। মন্দিরটি সরযূর একেবারে কাছে। এখানে বহু ভক্ত আসেন ও পুজো দেন। শিবলিঙ্গের পাশে একটি বৃহৎ ফণাযুক্ত সর্পমূর্তি দর্শনীয়। এখানে আরও অনেক দেববিগ্রহ আছে।

সরযূ তীরে উচ্চ শিখরযুক্ত বহু দেবালয় বর্তমান। এক একটি মন্দির কয়েকটি শিখরযুক্ত। প্রধান 'শিখর'টির গায়ে কতগুলি 'অঙ্গ শিখর'ও যুক্ত। তার ফলে শিখরের সৌন্দর্য বহুগুণ বর্ধিত। চূড়াগুলিও সুদৃশ্য। প্রায় মন্দিরেই প্রতিষ্ঠাকালীন লিপি পাওয়া যায় না। সরযূর ওপারে 'রাম কা পৌড়ি'। কতকটা হরদ্বার বা হরিদ্বারের 'হর কা পৌড়ি'র মতো।

নদীতীর ছাড়িয়ে নগরে আবার প্রবেশ করে দক্ষিণমুখী রাস্তায় অনেকটা হেঁটে গেলে সুদৃশ্য 'তুলসী উদ্যান' পড়ে। এখানে উদ্যানে প্রবেশ করে সামনেই এক সুদৃশ্য মুক্তমণ্ডপে কবি তুলসীদাসের (খৃঃ ষোল শতক) উপবিষ্ট একটি সৌম্য মূর্তি প্রতিষ্ঠিত। মুখমণ্ডল শ্মশ্রুগুম্ফমণ্ডিত। তাঁর পেছনে দণ্ডায়মান অপর একটি বৈষ্ণব সন্তের মূর্তি আছে।

অযোধ্যা ছাড়িয়ে অনেকটা দূরে 'রণোপালি' বলে গ্রামটি একটি ঐতিহাসিক স্থান মনে করা যায়। এখানের 'শ্রীগুরুমন্দির'টি একটি দর্শনীয় দেবালয়। অনেকটা স্থান জুড়ে এই মঠ। প্রধান দ্বারপথ দিয়ে ভেতরে ঢুকে শ্রী ১০৮ নারায়ণ রামজী মহারাজের সমাধি মন্দির দেখা যায়। মহারাজ সমাধিস্থ হন ১৯২৩ খৃস্টাব্দে। এই সমাধি মন্দিরের 'দালান'টির ওপর গম্বুজ শিখর। পার্শ্ববর্তী একটি 'পঞ্চায়তন' মন্দির উল্লেখযোগ্য। বেদির চারকোণে চারটি ও মধ্যবর্তী একটি 'শিখর' নিয়ে মন্দিরটি 'পঞ্চায়তন' রীতির। পশ্চিমবাংলায় এ রীতির মন্দির প্রায় নেই বললেই চলে। মন্দিরে বিগ্রহ আছেন দশরথ, শ্রীরাম, জানকী, লক্ষ্মণ, ভরত, হনুমান, শ্রীচন্দ্রজী।

শ্রীগুরুমন্দিরের পুবদিকের দরজার নিচে একটি শক্ত পাথরের কড়িতে শুঙ্গ আমলের ব্রাহ্মী অক্ষরে খোদিত লিপি আছে। লিপিটি এই—

'দ্বিরশ্বমেধযাজিনঃ সেনাপতেঃ পুষ্যমিত্রস্য ষষ্ঠেন

ধনদেবেন পিতুঃ রাজ্ঞঃ ফল্গুদোস্য কেতনং কারিতম্।'

সংস্কৃত ভাষায় রচিত এই লিপিটির অর্থ হল—

'সেনাপতি পুষ্যমিত্র যিনি দুবার অশ্বমেধ যজ্ঞ সম্পন্ন করেছিলেন, তাঁর অধস্থান ষষ্ঠপুরুষ ধনদেব তাঁর পিতা রাজা ফল্গুদেবের স্মরণে এই সৌধ (মন্দির) নির্মাণ করান।'

তাহলে এই লিপি থেকে জানা যাচ্ছে, সুদূর শুঙ্গযুগেও এখানে বা এই অঞ্চলে একটি মন্দির প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। লিপিটি অবশ্যই খৃস্টপূর্ব দ্বিতীয় শতকের।

অযোধ্যা থেকে প্রায় কুড়ি মাইল দূরে 'মখৌড়া' নামে যে গ্রামটি আছে সেখানে রাজা দশরথ পুত্রেষ্টি যজ্ঞ করেন। 'মখ' কথাটির অর্থ হল 'যজ্ঞ' অর্থাৎ যেখানে যজ্ঞ হয়েছিল। গ্রামটির পাশ দিয়ে সরযূ বয়ে চলেছে। অযোধ্যা ও তার পরিমণ্ডলের মধ্যে এই সব স্থান পুরাতত্ত্বের দিক থেকে খুবই গুরুত্বপূর্ণ। ওইসব স্থানেও উৎখনন হয়েছে শ্রীরামচন্দ্র সম্পর্কিত অনেক রহস্য উদ্‌ঘাটিত হয়েছে। অযোধ্যা ও তার আশপাশে প্রাচীন মন্দির বহু ছিল। বেশির ভাগই মুসলমান শাসকদের অত্যাচারে ধ্বংস হয়ে গেছে। রাজ্য জয় করে মুসলমানদের প্রধান লক্ষ্য ছিল, এক এক করে হিন্দুদের উচ্চ শিখর যুক্ত মন্দিরগুলোকে একেবারে মাটিতে মিশিয়ে দেওয়া। একারণে সে যুগের মন্দিরের আর কোনো চিহ্ন দেখতে পাওয়া যায় না। মন্দিরলিপি ও অঙ্গহীন কোনো কোনো দেববিগ্রহ থেকে প্রাচীন মন্দিরের অস্তিত্ব জানা যায়। বর্তমান পুরাতাত্ত্বিক উৎখনন থেকে 'রামজন্মভূমি' টিলা একটি ভব্য মন্দির ছিল, একথা আদালতের রায়েও বলা হয়েছে।

আগামী লোকসভা নির্বাচনে শ্রদ্ধেয় মোদীজীর নতুন ভারত গড়ার সাফল্য কামনা করি—

সর্ব্বে ভবন্তু সুখিনঃ, সর্ব্বে সন্তু নিরাময়াঃ।
ফোন- ৯৪৩৪৮১৯৭৬০

ধূলিকণা
প্রোঃ- সীমা চক্রবর্তী
প্রসিদ্ধ
আয়ুর্বেদিক ঔষধ বিক্রেতা।

স্বপন চক্রবর্তী
সকল প্রকার রোগের অভিজ্ঞ আয়ুর্বেদ চিকিৎসক।
সময় - সকাল ৯ টা থেকে সন্ধ্যা ৬ টা।
নেতাজী সুভাষ পল্লী, গাজোল, মালদহ।

# বিশ্ব-স্বাস্থ্য-দিবসের অনুষ্ঠান

**কৌশিক গুহ**

চারপাশে ভোট ভোট করে বড় বেশি মাতামাতি দেখলে ছোটোরাও ভোট ভোট খেলে। মিছিল মিটিং স্লোগান দেয়। তারা লালনীল হলুদ সবুজ কাগজ দিয়ে পতাকা তৈরি করে। ওদের ভোট ভোট খেলায় মারপিঠ হয় না। দেওয়াল লেখা পুরোপুরি বন্ধ। ছোটন চক দিয়ে লিখেছিল ছোটোদাদুর ঘরের দেয়ালে। ছোটোদাদু ডেকে বললেন, 'ভোটওয়ালারা দেওয়ালে লিখে নোংরা করছে, তোমরা নিশ্চয়ই তা চাও না?' ছোটন আর তপা দেওয়াল মুছে দিয়েছিল কোনো কথা না বলে। ছোটোদাদু চকোলেট দিয়েছিল দুজনকে।

ওদের থেকে একটু বড়োরা বিশ্ব স্বাস্থ্য দিবসে কিছু করার কথা ভেবেছিল। এ বছর পাড়ার অনেকে ভোট নিয়ে মেতে গেছে। তারা স্বাস্থ্যদিবস মাথায় রাখছে না। শুধু একটাই কথা তাদের 'ওই আসছে ভোটদিবস।' তবে ভোটরঙ্গের বাইরে থাকা লোকজনই বেশি। ভোট অবশ্যই দেবে, তবে তা নিয়ে মাতামাতি আর চেঁচামেচি করে না। যে-যার কাজ নিয়ে ব্যস্ত। বাড়ির কাজ, বাইরের কাজ। প্রশান্তকাকাকে বলল দীপকরা, '৭ এপ্রিল বিশ্ব-স্বাস্থ্য-দিবস। কিছু করা যাবে তো?' প্রশান্ত বলল, 'তোরা ভাব কি করা যায়। আমিও ভাবছি। সবাই মিলে কিছু করা যাবে। তবে রাজনীতিওয়ালাদের বলিস না, ডাকিস না। ওরা এখন ভোটকেই ধ্যান-জ্ঞান করেছে। আমরা ডাকলে তো সব দলকেই ডাকবো। তারা এসে বলতে পারে স্বাস্থ্য ভালো রাখার জন্যে আমাদের ভোট দিন। সে বড় সমস্যা হবে। আমরা ডেকে নেবো অন্য লোকদের।'

একটা দিন সকাল থেকে বিকেল পর্যন্ত অনুষ্ঠান হবে ঠিক করল ছোটোরা। যে-যার বাড়িতে জানাতে সমর্থন মিলে গেল। কিছু কাগজপত্র ছাপানোর দরকার ছিল। অশোক রায় নিজের প্রেস থেকে ছেপে দিলেন। সকলের কাছে পৌঁছে গেলো আবেদন। ওরা তিন জায়গায় ব্যানার লাগালো। এখন নিয়ম হয়েছে ভোটওয়ালারা যেখানে খুশি প্রচারের কিছু লাগাতে পারবে না। ভোরবেলা সুমানসরা বিশ্ব স্বাস্থ্য দিবসের ব্যানার লাগিয়েছিল। দুটো বেজায় মোটা, টিপ ছাপ দিয়ে মাইনে তোলা পুলিশ খৈনি খেতে খেতে বলেছিল, 'জানতা নেহি কোই পোস্টার-উস্টার লাগানা মনা হ্যায়? হটা লো। নেহি তো থানা মে লে জায়েগা।' শংকরের বেজায় রাগ হচ্ছিল, সে বলল, 'পুলিশ পণ্ডিতজী, ইয়ে পোস্টার তো হমে লাগানে পড়েগা। আপলোক কৃপয়া থানাদারকো রিপোর্ট করাকে ফোর্স লেকর আনেকা বাদ হম ইয়ে ব্যানার খোলেগা। আপলোক কৃপা করকে থানা মে রিপোর্ট কিজিয়ে।' থানায় যেতে হলো না পুলিশের একটা জিপ এসে থামল। প্রশান্ত বলল জিপ থেকে নেমে আসা অফিসারকে, 'দেখুন, এই ব্যানারটা লাগানো হচ্ছে। আপনার সিপাইরা খুলে দিতে বলছে।' অফিসার হেসে বললেন, 'তোমরা লাগাও। ও দুটো একেবারে মূর্খ। তোমাদের কাছে পয়সা চায়নি তো? ওই একটা ব্যাপার ভালো জানে।'

স্বাস্থ্য দিবসের অনুষ্ঠান হলো ভালো করে। ছোটোদেরই উদ্যোগ। বড়োরাও সঙ্গে আছে। টাকাপয়সা পরামর্শ দিয়ে সাহায্য করেছে। পাড়ার মধ্যে দুজন ডাক্তার আছে। সুমন্ত মজুমদার অমিত মুখোপাধ্যায় সবসময় পাশে থেকেছে। তাদের কয়েকজন ডাক্তার বন্ধুকে অনুষ্ঠানে থাকার জন্যে বলেছিল। স্বাস্থ্য-পরীক্ষা আর স্বাস্থ্য সম্পর্কে পরামর্শ দেওয়াটাই ছিল প্রধান কাজ। এছাড়া ছিল পোস্টার প্রদর্শনী। ছোটোরা দল বেঁধে তৈরি করেছিল কিছু। আর কিছু দিয়েছিল প্রশান্ত বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার ছাপা পোস্টার। 'সকলের জন্যে স্বাস্থ্য'— এটাই ছিল মূল কথা। বেশ জমে গিয়েছিল অনুষ্ঠান। যেসব ডাক্তারবাবু এসেছিলেন তাঁরা সকলকে ভালো করে বোঝালেন কেন শরীর সুস্থ রাখতে হবে। কীভাবে সুস্থ থাকা যাবে। তামাকের বিরুদ্ধে প্রচার ছিল ভালো মতোন। চারটে পুলিশকে পাঠিয়েছিলেন থানার অফিসার। বলেছিলেন, 'তোমাদের অনুরোধ, চারজন সিপাইকে পাঠালাম। এদের একটু স্বাস্থ্য-পরীক্ষা করিয়ে দিও।' প্রশান্তরা দেখল, চারজনের মধ্যে সেই খৈনি খাওয়া বেজায় মোটা দুজন সিপাই আছে। আর দুজন রোগা। দীপক বলল, 'একটু বসুন আপনারা, হয়ে যাবে।' এক সিপাই-এর পকেটে উঁচু হয়েছিল খৈনির ডিবে। প্রশান্ত বলল পরিষ্কার বাংলায়, 'খৈনির ডিবেটা প্যান্টের পকেটে রাখুন। ডাক্তারবাবু দেখলে রেগে যাবেন।' সিপাই সঙ্গে সঙ্গে ডিবেটা আড়াল করল প্যান্টের পকেটে ঢুকিয়ে।

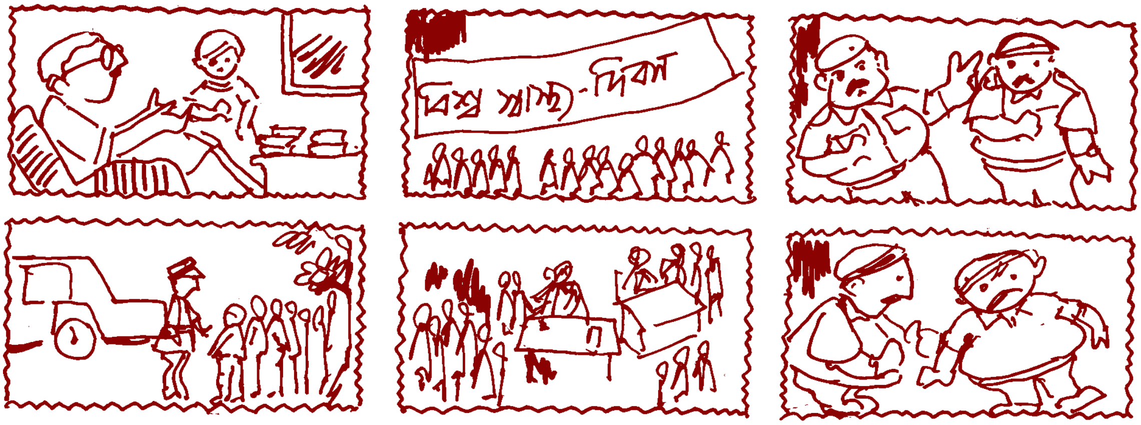

***ছবি : রমাপ্রসাদ দত্ত***

## বই কথা কই

# সৌমিলি গান আর আবৃত্তি শিখেছিল ঠাকুমার কাছে

ঠাকুমার কাছে গল্প শোনার মজাই অন্যরকম। সৌমিলি ভাবে মাঝে মাঝে ঠাকুমা এত গল্প কোথা থেকে শিখল। বইটই পড়েছে? না, ছোটবেলায় যা শুনেছিল তাই মনে রেখেছে? ঠাকুমার কাছে অনেক গল্পই বার বার শোনা। মনে মনে ছবি এঁকে নিয়েছে। এখন নিজে পড়ে নানান বই। ঠাকুমাকে পড়ে শোনায়। বানান উচ্চারণ ঠাকুমা শিখিয়ে দেয়। বলে, ভুল বানান লেখা হলে যেমন মুশকিল, ভুল উচ্চারণ হলেও তেমনি সমস্যা। বুঝে পড়ার জন্যে আস্তে আস্তে প্রতিটি শব্দ উচ্চারণ করা চাই। অনেকে খুব তাড়াতাড়ি কথা বলতে চায়। এতে কথা এলোমেলো হয়ে যায়। অন্যেরা ঠিকমতো বুঝতে পারে না। তাড়াতাড়ি কথা বললে পরে অনেকরকম অসুবিধে হতে পারে।

ঠাকুমা কবিতা পড়ে শোনাত, কিংবা না দেখে আবৃত্তি করত। ঠাকুমার স্মৃতি শক্তি বেশ জোরালো। স্কুলে পড়া কোনো কোনো কবিতা একেবারেই ভোলেনি। আবৃত্তির সময় কাগজ দেখা পছন্দ নয় ঠাকুমার। ভোরে উঠে আবৃত্তি অভ্যেস করাতো। একসঙ্গে পুরোটা নয় একটু একটু সবটা। তারপর বার বার বলা। মনের মধ্যে গেঁথে নেওয়া। ঠাকুমা অনেক বড় বড় কবিতা না-দেখে বলে যেত। ওই বলার মধ্যে থাকত আকর্ষণ। নতুন যে শব্দটা শুনল সেটার মানে জেনে নিও। উচ্চারণও। ঠাকুমা বলেছে বার বার, মনোযোগ চাই লেখাপড়ার জন্যে। ডিকশনারি দেখার কথা বলেছে বার বার। কোনোকিছু শেখাই সহজ নয়। একটু একটু করে সব রপ্ত হয়ে যায়। যে স্পষ্ট উচ্চারণ করে আস্তে আস্তে কথা বলে তার শ্রোতাদের কোনোরকম অসুবিধে থাকে না। যোগাযোগের সেতু তৈরি হয়ে যায়। পাঠ শোনার আসর অনেক জায়গায় বসে। অন্যমনস্ক শ্রোতা শুনলেও বুঝতে পারে না। তার মনে কোনো প্রশ্নও জাগে না। মনোযোগী শ্রোতা সব শোনে।

শুনতে শুনতে তৈরি হয়ে যায় কান মন। গান করার সময় সুর তাল লয় ছন্দকে মানতেই হবে। আর বোঝাও চাই। মুখস্থ করে না বুঝে গাওয়া আর মুখস্থ করে বুঝে গাওয়ার মধ্যে তফাত যথেষ্ট। বুঝে গান গাইলে তা একেবারে ছবির মতো রূপ নেয়। আবৃত্তি, পাঠ অবশ্যই জরুরি। উচ্চারণ ঠিকমতো হলে নিজেরও ভালো লাগবে। গলার স্বর একেকজনের একেকরকম। সব গান অন্যরা শুনে আনন্দ পাবে বৈকি। গান সম্পর্কে বলা হয়, গান যে করে তার তো বটেই যে শোনে তারও। শোনার পর শ্রোতার মন ভরে গেলে গায়ক খুশি। আর শ্রোতার মন যদি তৃপ্তি না পায় তা হলে বুঝতে হবে ফাঁক থেকে গেছে। ঠাকুমার কাছে ওইসব শুনে আবৃত্তি আর গান করার পর দেখেছে তা সকলের কাছে পৌঁছে দেওয়া সম্ভব হচ্ছে। তার মধ্যে পাওয়া যায় গাওয়ার আনন্দ। সৌমিলি অন্যদের বলে, ‘ঠাকুমার কাছে বসে গল্প আর গান শোনার মধ্যে কতকিছু সহজ ভাবে শিখে নিতে পেরেছি।’

**বইমিত্র**

---

## সদানন্দের দিনযাপন

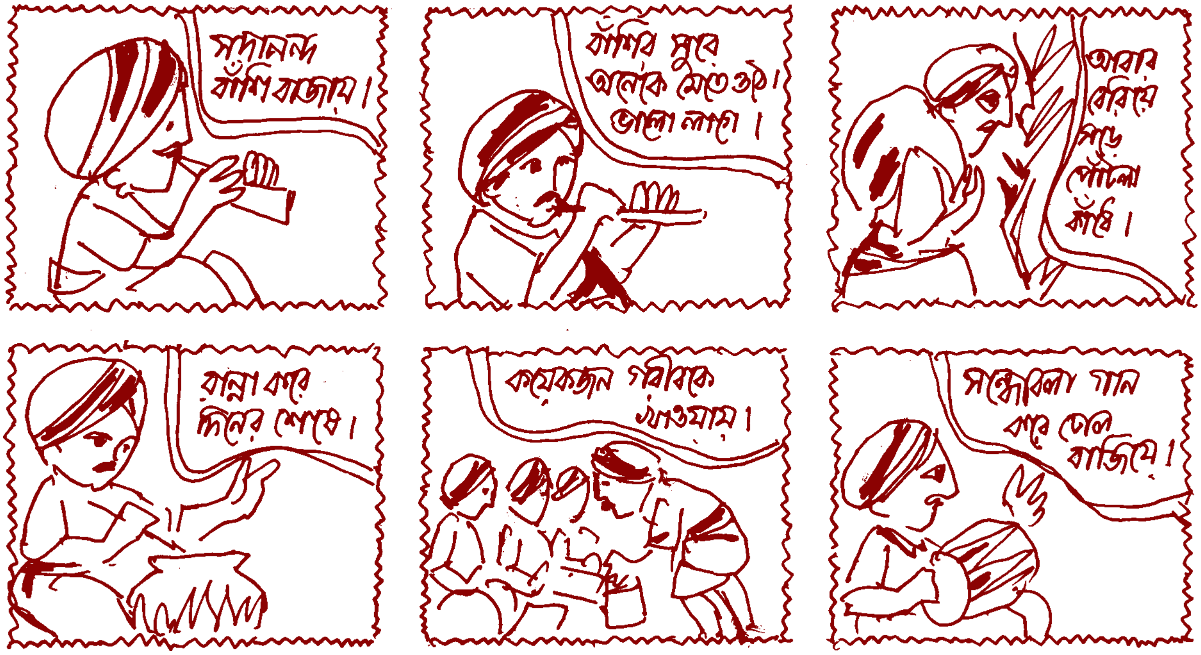
সদানন্দ বাঁশি বাজায়।
বাঁশির সুরে অনেকে মেতে ওঠে। ভালো লাগে।
আবার বেরিয়ে পড়ে পোঁটলা কাঁধে।
রান্না করে দিনের শেষে।
কয়েকজন গরীবকে খাওয়ায়।
সন্ধেবেলা গান করে ঢোল বাজিয়ে।

জাতীয়তাবাদী বাংলা সংবাদ
সাপ্তাহিক
পড়ুন ও পড়ান

**স্বস্তিকা**

গ্রাহক হোন, গ্রাহক করুন
সডাক বার্ষিক গ্রাহকমূল্য
৪০০্ টাকা

**Ori Plast**

**P.V.C. Threaded Pipes.** For deep Tubewell & general sanitation. Substitutes to conventionnal G.I. Pipes

***Authrorised Distributor :***

**NATIONAL PIPE & SANITERY STORES**

54, N. S. Road. Kolkata-700001. Ph. : 2210-5831, 2210-5833
3, Jadu Nath Dey Road, Kolkata-12, Ph. 2215-6804, Fax : 2212-2803

**PARTHA SARATHI CERAMICS**

4, College St. Kalkata-700012. Ph. :2241-6413/5986

*"প্রত্যেক সুশিক্ষিত নরনারী তার নিজের জাতির পক্ষে বা সমগ্র মানবজাতির ইতিহাসে এক শ্রেষ্ঠ স্তম্ভস্বরূপ হয়ে দাঁড়ায়।*

*জগৎ যেন প্রত্যেক আত্মার শিক্ষালাভের জন্য একটি বিদ্যালয় বা ব্যায়ামাগার। মানবতা একটি কাঁচের ঘর নয়, যাতে একই চিত্র বারবার প্রতিফলিত হয়, কোথাও ভাল, কোথাও বা মন্দভাবে। ঈশ্বর আমাদের সকলের মধ্যে প্রকৃষ্ট ও বিভিন্নভাবে তাঁকে প্রতিফলিত দেখতে চান।"*

*— ভগিনী নিবেদিতা*

সৌজন্যে : ভগিনী নিবেদিতা সেবা ভারতী

# নারীবাদ, আধুনিকতা এবং নারী নির্যাতন

**স্বাগতা বন্দ্যোপাধ্যায়**

আজকাল ভারতে এক ধরনের নতুন নারীগোষ্ঠীর উদ্ভব হয়েছে যারা নিজেদের নারী না বলে ‘নারীবাদী’ নারী বলে পরিচয় দিতে গৌরব বোধ করেন। এদের এই অদ্ভুত বিকারগ্রস্ত দর্শনটির উদ্ভব ঘটে ফ্রান্সের নারী আন্দোলনের জননী সিমন ডি ব্যুভেয়ার-এর হাত ধরে। তবে দুঃখের বিষয় এই মহিলা দার্শনিক এবং চিন্তাবিদের চিন্তার সঙ্গে আধুনিক নারীবাদের প্রায় কোনো মিলই খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না। ৬০-এর দশকের এই মহিলা চিন্তাবিদের মূল বক্তব্য ছিল, এই পৃথিবীতে পুরুষ ও নারী উভয়ই ঈশ্বরের সৃষ্টি, উভয়েই মানুষ। ঈশ্বরের সৃষ্টি তত্ত্ব মানলে দেখা যায় এরা একে অপরের পরিপূরক। অতএব উভয়ের জন্যই চাই সমান মর্যাদা এবং অধিকার। নারী যেহেতু পুরুষের মতোই, তার স্থান কখনোই পুরুষের পায়ের তলায় হতে পারে না। সিমন ডি ব্যুভেয়ারের বক্তব্যে বা ভাবনায় কোনো ভুল ছিল না। কিন্তু সমস্যা শুরু হলো তখনই যখন এই তত্ত্বটি গিয়ে পড়ল মার্কিন বুদ্ধিজীবীদের হাতে। এক শ্রেণীর মার্কিন মহিলা বুদ্ধিজীবীদের হাতে পড়ে এই তত্ত্বটির মূল বক্তব্যই পাল্টে গেল এবং নারীবাদী দর্শন থেকে এটি রূপান্তরিত হয়ে উঠল এমন এক দর্শনে যার মূল মন্ত্র ছিল কিছু বিকারগ্রস্ত চিন্তাভাবনা এবং অকারণ উগ্র পুরুষবিদ্বেষ। কালক্রমে এই বিকৃত ভাবধারাই ‘নারীবাদ’ রূপে খ্যাতি পেলো এবং গোটা পৃথিবীতে আস্তে আস্তে থাবা বসানো শুরু করল।

১৯৯০ সালে বিবিসি-কে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে সিমন ডি ব্যুভেয়ার অত্যন্ত দুঃখ এবং ক্ষোভ প্রকাশ করে বলেছিলেন যে তার চিন্তা বা দর্শন মার্কিন মহিলা বুদ্ধিজীবীদের হাতে পড়ে সারা পৃথিবীতে যে অসুস্থ সামাজিক পরিবেশের বীজ রোপণ করেছে তার জন্য তিনি দুঃখিত, লজ্জিত এবং বিশ্ববাসীর কাছে ক্ষমাপ্রার্থী।

এই সময় দর্শনটি মার্কিনিদের হাতে পড়ার পর দুটি বিশেষত্ব লাভ করে—একটি হলো অকারণ উগ্রপুরুষ বিদ্বেষ এবং অপরটি হলো চূড়ান্ত উচ্ছৃঙ্খলতা ও বিবাহ-বহির্ভূত অবাধ যৌনতা, এই দুটি বিশেষত্বের দৌলতে সারা বিশ্বের মূল্যবোধহীন, সংস্কারহীন, রুচিহীন, চরম ভোগবাদী মহিলাদের মধ্যে দুর্বার গতিতে এই নয়া ‘বাদ’টি ছড়িয়ে পড়ে এবং পশ্চিমী দেশগুলোর অল্পবয়সী তরুণী ও যুবতীদের মধ্যে ভীষণরকম জনপ্রিয়তা লাভ করে ও শক্তিশালী হয়ে ওঠে। বিশ্বায়নের ঘাড়ে ভর করে ৯০-এর দশকে পুবের দেশগুলেতে এই ‘বাদ’টির আস্তে আস্তে অনুপ্রবেশ ঘটে। তারপর এই দশকের মধ্যভাগ থেকেই পুবের দেশগুলিতে বিশেষ করে ভারতে পাকাপোক্তভাবে ঘাঁটি গাড়ে।

গত দু’ দশক ধরে নারীবাদ নামক এই বিশেষ ভয়ঙ্কর দর্শনটি ভারতের সামাজিক জীবনে বেশ প্রভাব বিস্তার করেছে। ভারতের সামাজিক জীবন বলা হয়ত ঠিক হচ্ছে না, কারণ গোটা দেশের সামাজিক জীবন আজও বোধহয় একই সূত্রে বাঁধা নেই। বিশ্বায়নের খাতিরে ভারত আজ দু’ ভাগে বিভক্ত— একটি ভারত, অপরটি ইন্ডিয়া। ইন্ডিয়া নামক দেশটিতে যে বড় শহরগুলি রয়েছে তার মধ্যে বেশ কিছু, যেমন কলকাতা, দিল্লী, মুম্বই, নয়ডা, ব্যাঙ্গালোর, হায়দরাবাদ, চণ্ডীগড়, লুধিয়ানা, পুনা, নাসিক— শহরগুলিতে বসবাসকারী উচ্চবিত্ত, অতি স্বচ্ছল মধ্যবিত্ত এবং মধ্যবিত্ত পরিবারের ‘তথাকথিত শিক্ষিতা’ মহিলাদের মধ্যে এই ‘নারীবাদ’ ভয়ঙ্কর প্রভাব বিস্তার করেছে। চিন্তায়, চেতনায়, আদব-কায়দায়, পা থেকে মাথা পর্যন্ত পশ্চিমী ভোগবাদে নিমজ্জিত ‘আধুনিক’ নারীসমাজের ‘মন্ত্র’ হয়ে দাঁড়িয়েছে এই নারীবাদ। নারীবাদ প্রত্যেক দেশেই তার মতন করে সে দেশের একেবারে গোড়ায় পৌঁছানোর একটা রাস্তা খোঁজে। ভারতের ক্ষেত্রে ভারতে প্রবেশ করার রাস্তা হিসেবে বর্তমান ‘ভারতীয় আধুনিকতা’কে বেছে নিয়েছে।

ইদানীং ভারতীয় মহিলাদের মধ্যে একটা প্রবণতা দেখা যাচ্ছে যে, আধুনিক হতে গেলে তাকে নারীবাদী হতেই হবে। ভাবটা এমন যেন নারীবাদের ধামা না ধরে আধুনিকতা যেন

এক পাও এগোতে পারবে না। কিন্তু সত্যিকারের আধুনিকতার সঙ্গে নারীবাদের ধামাধরা এই আধুনিকতার কোনো সম্পর্ক নেই। এটি একটি বিকৃত মানসিকতার চর্চা যার সঙ্গে প্রকৃত আধুনিকতার কোথাও কোনো মিল নেই। এমনকী প্রকৃত নারীবাদেরও কোনো মিল নেই। এই আধুনিকতা সেই আধুনিকতা নয় যার কথা স্বামী বিবেকানন্দ, মা সারদা, রানি লক্ষ্মীবাঈ, প্রীতিলতা ওয়াদ্দেদার, ভগৎ সিং, বীর সাভারকর, বিদ্যাসাগর বা নেতাজী সুভাষচন্দ্র বলে গেছেন। স্বাধীনতার নামে চূড়ান্ত স্বেচ্ছাচারিতা, অতিমাত্রায় অসহিষ্ণুতা, দেশীয় সংস্কৃতিকে নিরন্তর নিন্দা করাই হচ্ছে এই আধুনিকতার মূল ভিত্তি। পুরুষকে এরা ভাই, স্বামী বা বন্ধু হিসেবে কামনা করে না, কামনা করে শুধুমাত্র নিজের রূপের প্রশংসাকারী একজন ভোগের সামগ্রী হিসেবে। এখানেও আবার গোলমাল অর্থাৎ এদের নিজেদের কাজের সঙ্গে এদের প্রদত্ত তত্ত্বের পুরোপুরি অমিল। কি করে? বিষয়টা হচ্ছে এরকম যে সমাজের আর পাঁচজন সুস্থ রুচিশীল নারীদের তুলনায় নিজেদের 'সামথিং ডিফারেন্ট' বা একটু অন্যরকম দেখানোর জন্য তারা অকারণ পুরুষ বিদ্বেষ ছড়িয়ে বেড়ায়, কিন্তু পুরুষের উপর তারা বড়ই নির্ভরশীল।

কিছুদিন আগে একটি সমীক্ষায় দেখা গেছে এই মুহূর্তে ভারতে এই নারীবাদী আধুনিকাদের সংখ্যা নেহাত খুব কম নয়। বড় সাতটা শহরের প্রায় ৪৪ শতাংশ মহিলা এই শ্রেণীর অন্তর্গত। এদের মধ্যে আবার যারা অতিমাত্রায় বিকারগ্রস্ত তারা সমকামী। প্রকৃতির বিকারগ্রস্তরা আবার নিজেদের এই অদ্ভুত বিকারকে সামাজিক কারণের দাবিতে মাঠে ময়দানে নেমে ৩৭৭ ধারার প্রতিবাদে মোমবাতি নিয়ে রাস্তায় নেমে সমাজকে আলো দেখানোর চেষ্টা করেন। পশ্চিমী অপসংস্কৃতির প্রভাবে ভারতে বর্তমান প্রজন্মের নারীদের মধ্যে এই বিকৃত দর্শনটি খুব দ্রুত প্রভাব বিস্তার করছে। শিল্প সংস্কৃতির জগতে তো এরা রীতিমত 'নক্ষত্র'। বিজ্ঞাপন জগতে ভোগ্যপণ্য হিসেবে নিজেদের বিকিয়ে দেওয়ার ক্ষেত্রে এদের তুলনা নেই। অনেক নারীবাদীকেই আজকাল দেখা যাচ্ছে নারী নির্যাতনের প্রতিবাদে সম্পূর্ণ বস্ত্রহীন অবস্থায় কালো মার্কার দিয়ে বড় বড় করে 'নো এন্ট্রি' বা প্রবেশ নিষেধ লিখে প্রতিবাদে সামিল হচ্ছে এবং মিডিয়ার সামনে বাইট দিচ্ছে। কিন্তু মজার ব্যাপার, নারী নির্যাতন এতে কমছে তো না বরং দিন দিন বেড়েই চলেছে, তার কারণও এই বিকৃত চিন্তা বা জীবনচর্চার মধ্যেই হয়ত নিহিত আছে। আর তাদের এই প্রতিবাদ অশ্লীলতার প্রদর্শন ছাড়া কিছুই নয়।

বিকৃত চিন্তার বীজ একবার বপন করা হলে তার বিষ সর্বত্রই ছড়ায়। এই বিকৃত দর্শনটি শক্তিশালী হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে এক শ্রেণীর বিকারগ্রস্ত পুরুষের প্রাদুর্ভাব ঘটেছে যারা এই নারীদের মতনই বিকৃত চিন্তার অধিকারী এবং একই রকমভাবে ধারক ও বাহক। এই বিকৃত চিন্তা, উচ্ছৃঙ্খলতা, বল্গাহীন অসভ্যতা ও অবাধ যৌনতার সুযোগ নিয়ে এরা সব শ্রেণীর নারীদেরই নিজেদের ভোগের সামগ্রী বানাতে চায়। এরকম বহু ঘটনার অনুসন্ধান করতে গিয়ে দেখা গেছে এ ধরনের পুরুষের বন্ধুর চেয়ে বান্ধবীদের সংখ্যাই বেশি এবং বলা বাহুল্য এই বান্ধবীরা অধিকাংশ ক্ষেত্রেই অতিমাত্রায় নারীবাদী। এই নারীবাদীরা যদি তাদের ভাবনা বা লাইফ স্টাইল নিজেদের মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখত তাহলে হয়ত আমাদের খুব কিছু এসে যেত না, কিন্তু তাতো হচ্ছে না, তারা তাদের এই বিকৃত চিন্তাধারা সমাজে ছড়িয়ে দিয়ে সুকৌশলে সমাজকে অধঃপতনের পথে টেনে নিয়ে যাচ্ছে। কেন এক শ্রেণীর এই নারীদের জন্য অন্যান্য নারীদের বিকৃত চিন্তার অধিকারী পুরুষদের লালসার শিকার হতে হবে? কেন শুধুমাত্র এই নারীরাই সমাজে আধুনিকা বলে স্বীকৃতি লাভ করবে আর বাকি সুস্থ রুচিশীলা নারীরা সমাজে পিছিয়ে পড়া নারী হিসেবে পরিগণিত হবে? নারীবাদীরা উত্তর দিন। নারীবাদ আরো একটা কারণেও আজ আমাদের কাছে ঘাতক। যেহেতু এখন এই নারীবাদী নারীরাই আধুনিক সমাজের নয়নের মণি হয়ে উঠেছে, সেহেতু ভারতের উঠতি বয়সী কিশোরী ও যুবতীদের মধ্যে এরাই এখন একমাত্র আইকন বা 'আদর্শ' হয়ে উঠেছে। পত্রপত্রিকা থেকে পড়ার বই— এই অর্ধ বা সম্পূর্ণ উলঙ্গ নারীদের আজ জয়জয়কার। সিভিল সার্ভিসের প্রশ্নপত্রের কারেন্ট অ্যাফেয়ার্স বিভাগের ৪৫ শতাংশ প্রশ্ন এই 'উলঙ্গ সাহসিনী'দের নিয়ে, তাদের জীবন-যাপন, পেশাগত জয়-পরাজয় নিয়ে তৈরি করা হয়। আজকাল এরাই 'আইকন'। এরা নাকি দেশ গড়বে!

কিশোরীদের কাছে এদেরই আদর্শরূপে তুলে ধরা হচ্ছে। আজ আমরা একটি আধমরা দেশের ধ্বংসস্তূপে দাঁড়িয়ে রয়েছি, কারণ এখনো এই বিকৃত চিন্তার অধিকারিণীরা হয়ত পুরো থাবা বসাতে পারেনি। যেদিন পুরো থাবা বসাতে পারবে সেদিন এই সীতা-সাবিত্রী-দময়ন্তীর দেশ সম্পূর্ণ ধ্বংস হয়ে যাবে।

ঁভবতারণ দীর্ঘাঙ্গী
(প্রয়াণ দিবস - ১৩.৪.২০১৩)

দাদু, তুমি যেখানেই থাকো, আমাদের আশীর্বাদ কর।

**আদিত্য দীর্ঘাঙ্গী (রাজ), অর্চ্চিস্মান মিশ্র, অনির্বাণ মিশ্র।**

পাইকপাড়া, জগৎবল্লভপুর, হাওড়া

# মুসলিম রাষ্ট্রগুলিতে পরিবর্তনের হাওয়ায় মোল্লা-মৌলবীরা হয়রান ও বিরক্ত

**অতিথি কলম**

**মজফ্‌ফর হোসেন**

মহান সমাজবাদী নেতা ড. রামমনোহর লোহিয়ার কথানুসারে অল্পকালীন ধর্মের নাম রাজনীতি ও দীর্ঘকালীন রাজনীতির নাম হলো ধর্ম। কিন্তু ইসলামের বিশাল মোল্লা-মৌলবীর দল এবং ইসলামি আইনবিশেষজ্ঞরা বলে আসছেন যে ইসলাম এই ব্যাখ্যার অনেক ঊর্ধ্বে। যা রাজনীতি তাই ধর্ম (মজহব) ও যা ধর্ম তাই রাজনীতি। কিন্তু অধিকাংশ অশান্তি ও অরাজকতায় নিপীড়িত মুসলিম রাষ্ট্রগুলি এখন স্বীকার করতে শুরু করছে যে মজহব ও রাজনীতি দীর্ঘ সময় ধরে একসঙ্গে রাখা যায় না। কয়েকবছর আগে মুসলিম দেশগুলি যে রকম আইন তৈরি করেছে ও সিদ্ধান্ত নিয়েছে তার ফলে একথা স্পষ্ট হয়ে গিয়েছে যে, ষষ্ঠ শতাব্দীর আইন ও ব্যবস্থার নিয়ম একবিংশ শতাব্দীর উপযোগী হতে পারে না। সেজন্য এখন বিশ্বের মুসলিম দেশে একপ্রকার পরিবর্তন দেখা যাচ্ছে। পরিস্থিতির পরিপ্রেক্ষিতে সেখানকার শাসকরা পরিবর্তনের চরম সত্যকে স্বীকার করতে বাধ্য হয়েছেন। একটা সময় ছিল যখন রাজনৈতিক বিপ্লব করনেওয়ালারা নিজেদের মতকে আইনসিদ্ধ ও সফল করার জন্য প্রাচীনকালের নিয়ম-কানুনকে চালু করে প্রমাণ করতে চেয়েছিল যে তারা যা কিছু করছে নিজেদের ধর্মগ্রন্থের বিধান অনুসারেই করছে। এক সময় খৃস্টান রাষ্ট্রও এরকম ছিল। কিন্তু প্রোটেস্টান্ট বিচারধারা এমন পরিবর্তন এনেছিল যে, ইউরোপ ও আমেরিকার ক্ষমতা অনেক দেশে স্থাপিত হয়েছিল। ইহুদিরাষ্ট্র ইজরায়েলেরও এরকমই চিন্তাভাবনা ছিল। আজ পর্যন্ত তারা এর প্রভাব থেকে মুক্ত হতে পারেনি। বিজ্ঞানজগতে যে গবেষণা ও সন্ধান চলছে তাতে ইহুদি বৈজ্ঞানিকদের বড় রকমের ভূমিকা থাকার ফলে এই পরিধি আরও বিস্তৃত হয়ে চলেছে। প্রাচীনকাল থেকে রাজনৈতিক ক্ষমতাকে অধিকার করাই নয়, বরং দীর্ঘ সময় চালানোর জন্য ধর্ম একটি শক্তিশালী মাধ্যম কিন্তু বৈজ্ঞানিক প্রগতি এর ভিত্তিকে নাড়িয়ে অথবা ছোট করে দিয়েছে। দুঃখের বিষয় যে, ইসলামের মোল্লা-মৌলবীরা এই পেষণযন্ত্র থেকে মুক্ত হতে পারেনি। এর ফল এদের ভুগতে হচ্ছে। এখন একবিংশ শতাব্দীতে তাদের বেড়ি ভেঙে পড়তে দেখা যাচ্ছে। এজন্য মধ্যপ্রাচ্যের ইসলাম- বিশেষজ্ঞরা এটা বলতে শুরু করেছেন যে, এখন ইসলাম রাজসত্তা ও ব্যবস্থার উৎস কোরান ও সুন্না, তার থেকে কি মুক্ত হচ্ছে? অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক ও সামাজিক পরিবর্তনের জন্য কি তাদের পরিবর্তনের সূচনা হয়েছে?

*স্বাধীনতা দিবসে ঢাকায় সমবেতভাবে জাতীয় সঙ্গীত গাইছে বাংলাদেশের মানুষ।*

### ইসলামি লহর

সূচনা যদি ভারতীয় উপমহাদেশ থেকে করা হয় তো আমাদের সামনে বাংলাদেশ উদাহরণ হিসাবে আছে। এক সময় মুজিবুর রহমানের হত্যার পর জেনারেল জিয়াউর রহমানের বাঁশী সেখানে বাজতে শুরু করেছিল। ইসলামের নামে এমন ঢেউ উঠেছিল যে বাংলাদেশ ককিয়ে উঠেছিল। কিন্তু যখন কট্টরবাদের মূল উৎপাটন করা শুরু হলো তখন জামাতে ইসলামি নেতাদের ফাঁসিতে ঝোলানোর পালা এসে গেল। আজ বাংলাদেশে জাতীয়তাবাদ মাথাচাড়া দিয়ে ওঠেছে। ওখানকার সমস্ত নেতা বলতে শুরু করেছেন মজহবের রাজনীতির খেলায় বাংলাদেশকে অনেক পিছনে ঠেলে দেওয়া হয়েছে। বর্তমান প্রধানমন্ত্রী ও সুপ্রিম কোর্ট এই কথাকে প্রমাণ করে দিয়েছেন যে, মজহব প্রতিশোধ নেওয়ার জন্য ব্যবহার করা যেতে পারে কিন্তু কোনো রাষ্ট্রের প্রগতির জন্য কদাপি নয়। ইরানের ইসলামীবোমা বিশ্বের শক্তিগুলিকে ভীতসন্ত্রস্ত করতে পারে কিন্তু

ইরানের গরিব মানুষকে অন্ন-বস্ত্র-বাসস্থান দিতে পারে না। আয়াতুল্লা খোমেইনি থেকে আহমদ নিজাদি পর্যন্ত কট্টরবাদের রাজনীতির খেলা খেলছে। কিন্তু আমরা দেখেছি যে, ইরানের রাষ্ট্রপতি হসন রূহানী পরমাণুবোমা নির্মাণ ও নীতির বিষয়ে নিজের দেশের হিতের জন্য আমেরিকার সামনে মাথা নত করেছে। অর্থাৎ মজহবি কট্টরতার নামে দেশের ক্ষতি হতে দেননি।

**মজহবের আফিম**

মধ্যপ্রাচ্য ও আরবদেশগুলিতে ইসলামকে মাধ্যম তৈরি করে ওখানকার শেখ, রাজা ও স্বেচ্ছাচারী শাসকগণ দীর্ঘ সময় ধরে শাসন করেছেন। কিন্তু বর্তমানে ওখানে যে পরিবর্তনের হাওয়া দেখা যাচ্ছে তা এই কথা প্রমাণ করছে যে, এই ক্ষমতাবানরা বুঝে গেছেন মজহবের আফিম আর বেশিদিন কাজে লাগবে না। সৌদি আরবে মহিলাদের অধিকার দেওয়ার বিষয়ে চর্চা শুরু হয়েছে। কিছুদিন বাদে ওখানের মহিলাদের যদি রাস্তায় গাড়ি চালাতে দেখা যায় তো অবাক হওয়ার কিছু থাকবে না। সৌদি যুবক-যুবতীরা এখন কাজ চাইছে। এজন্য সরকারকে নতুন আইন পাশ করে বিদেশী শ্রমিকদের দেশ থেকে বের করে দেওয়ার আইন চালু করতে হয়েছে। ষাটের দশকে চতুর্থশ্রেণীতে পড়া এক ছাত্রীকে স্কুল পরিদর্শক যখন জিজ্ঞাসা করেছিলেন যে, 'তুমি এই ছড়া কেন মুখস্থ করেছ?' তখন ছাত্রীটি উত্তর দিয়েছিল, 'আমি ছড়া ভালবাসি'। 'ভালবাসা' শব্দ শুনতেই পরিদর্শক বিদ্যুৎস্পৃষ্টের মতো হয়ে 'ভালবাসা' শব্দ বলার দণ্ডস্বরূপ শুধু পাঠশালা থেকেই বহিষ্কার করার আদেশই দিলেন না, এই হতভাগ্য ও বেয়াদব মেয়ে যেন সৌদির কোনো স্কুলেই পড়াশুনার সুযোগ না পায় শিক্ষা বিভাগকে সে আদেশও দিয়েছিলেন। এখন সেই সৌদিই গত অলিম্পিকের উদ্বোধন অনুষ্ঠানের প্যারেডে অংশ নিতে দু'জন মহিলাকে পাঠিয়েছিল। মধ্যপ্রাচ্যের অনেক মুসলমান দেশ তাদের পাঠ্যপুস্তকের মধ্যে থেকে কোরান ও সুন্নার অংশ বাদ দিয়েছে। মিশর, টিউনেশিয়া, মোরক্কো ও আলজিরিয়ায় পর্দার বাধা দূর করা হয়েছে। শুধু এই নয়, সেখানের পাঠ্যপুস্তক থেকে জিহাদ শব্দ বাদ দেওয়া হয়েছে। সাপ্তাহিক পত্রিকা 'অল আলমুল ইসলামি' লিখেছে— ''কুয়েত সরকার স্কুলগুলিতে পর্দাকে নিষিদ্ধ করেছে। কোনো ছাত্রী এখন থেকে স্কুলে বোরখা ব্যবহার করতে পারবে না।'' রাবতা ইসলামিক নিউজ এজেন্সির এক সংবাদে লেখা হয়েছে— ''পরীক্ষার সময় কোনো ছাত্রী বোরখা পরে এলে আইনি ব্যবস্থা নেওয়া হবে।''

পাঠক ভালোভাবেই জানেন, তাজাকিস্তান, আর্মেনিস্তান, কিরগিস্তান ও অজারবাইজান-সহ ছ'টি দেশ সোভিয়েত রাশিয়া থেকে আলাদা হয়েছে। কোনো সময় ওখানে ইসলামি সাহিত্য খুব বেশি রকম প্রচার করা হয়েছিল। সমরখন্দ ও বুখারার গুণগান করতে আজও মুসলিম ঐতিহাসিকরা পঞ্চমুখ। সোভিয়েত রাশিয়ার প্রভাবেও এদের ইসলামি চরিত্র কতটুকু বদল হয়েছে তা গবেষণার বিষয়। কিন্তু রাশিয়া থেকে আলাদা হওয়ার সময় কট্টরপন্থীরা সেখানকার চরিত্র বদলে ফেলার কোনো দুর্বলতাই হাতছাড়া করেনি। এর বিশেষ প্রভাবও অনেক বিষয়ে দেখতে পাওয়া যাবে। তবু আবার এখন এই দেশগুলিতে প্রগতিশীলতার ঢেউ পুরো দমে চলছে। কিছু লোক মনে করেন যে, আগেকার সোভিয়েত রাশিয়ার প্রভাব হতে পারে এটা। কিন্তু এটাও ঠিক নয়। বিকাশের নামে আরব দেশ থেকে এখানে যারা আসছে তারা ইসলামি কট্টরবাদের চিন্তাধারা প্রচার করছে। কিন্তু ইদানিংকালেই তুর্কিস্তানের খবরের কাগজে যা কিছু ছাপা হচ্ছে তা পড়ে মনে হচ্ছে যে এই দেশগুলি আবার তাদের নিজস্ব কলা ও সংস্কৃতির প্রবাহে ফিরছে।

**কট্টরবাদ বিদায়**

'ইসলাম অন লাইন' থেকে প্রাপ্ত তথ্য অনুসারে তাজাকিস্তানের শিক্ষামন্ত্রী এক আদেশ দ্বারা ওখানকার সমস্ত বিদ্যালয়ে এমন পাঠ্যক্রম শুরু করেছেন যেখানে কণামাত্রও কট্টরবাদের স্থান নেই। এর জন্য দেশে গণতান্ত্রিক পরিবেশ থাকা প্রয়োজন। সেজন্য এখন ওখানে 'জম্হুরিয়ত (গণতন্ত্র)-এর গান গাওয়া চলছে। বিশেষ মনোযোগ এ বিষয়ের ওপর দেওয়া হচ্ছে যে, অন্য মত-পথের বিষয়ে কোনো প্রকার সঙ্কীর্ণতা দেখানো চলবে না। এজন্য পৃথিবীর বড় বড় দেবদূতদের জীবনীগুলি বিশেষভাবে পড়ানো হচ্ছে। অবাক হওয়ার ব্যাপার যে এতে পারসি ও কনফুসিয়াস ধর্মের বিবরণও পাওয়া যাচ্ছে। এই দেশগুলিতে কোনো সময় ভগবান বুদ্ধের খুব জনপ্রিয়তা ছিল। এজন্য কয়েক বছরের মধ্যে এখানে যদি আবার 'বুদ্ধং শরণং গচ্ছামি' স্তব শুরু হয়ে যায় তবে অবাক হওয়ার কিছু থাকবে না। সুফিদের মধ্যে মহিলা সুফি রাবেয়া'র বিষয়ও পড়ানো হচ্ছে। পাঠকদের বলে দিচ্ছি, আগেকার সোভিয়েত রাশিয়ার এই দেশগুলির ওপর এক সময় ইরানের খুব প্রভাব ছিল। মধ্যপ্রাচ্যের বিষয়ে অভিজ্ঞ মুতিউল্লা নাইব তাজকী 'ইসলাম অন লাইন'-কে বলেছেন, ''আমাদের প্রধান উদ্দেশ্য হলো বিচ্ছিন্নতাবাদ ও জঙ্গি চিন্তা-ভাবনা থেকে আগামী প্রজন্মকে বের করে আনা। তাদের মধ্যে সমরসতা ও সমানতার ভাব নির্মাণ হোক— এটাই আমাদের প্রধান লক্ষ্য।'' এই এলাকায় কট্টরবাদী চিন্তকদের মতে বর্তমান সরকার যেন তেন প্রকারেণ বর্তমান প্রজন্মকে বিচ্ছিন্নতাবাদ ও ঘৃণার মানসিকতা থেকে বের করে আনতে চাইছেন। কিন্তু কট্টরবাদীরা নিজেদের অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত রাখতে চাইছে। প্রশ্ন উঠছে— কাদের জন্যে? আমাদের দেশ ও আমাদের শ্রেষ্ঠ সংস্কৃতি এতই পোক্ত যে আমাদের কারো থেকে ভয়ভীত হওয়ার প্রয়োজন নেই। মজহবের সঙ্গে মনুষ্যত্ব জুড়ে আছে— এটাই বুনিয়াদিরূপে ইসলামের বার্তা। এজন্য যখন সব ধর্মমতই ওই একই রকম তখন আমাদের তাদের থেকে দূরে পালানোর কি প্রয়োজন? তাজাকিস্তানে যে রাষ্ট্রগীত তৈরি করা হয়েছে তাতে বলা হয়েছে দুনিয়ার সমস্ত দেশ একটি মালার মোতি। যদি আমরা নিজেদের মূল্যবান মোতি সুরক্ষিত রাখতে চাই তো এর জন্য প্রথম গ্যারান্টি এটা হতে হবে যে আমাদের অন্যদের সুরক্ষা দেওয়ার বিশ্বাস অর্জন করা। সুরক্ষার গ্যারান্টি কারোর ভয়, গোলামি অথবা তাতে স্বার্থ থাকা চলবে না।

**বিশেষ প্রতিবেদন**

# আজকের ডগল্যাস—কেজরিওয়াল

**শ্যামলকুমার হাতি**

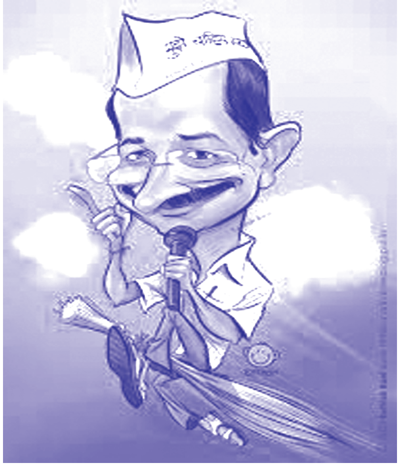

ভারতের রাজনৈতিক ময়দানে আম আদমি পার্টির আগমন খুবই সাম্প্রতিক। তবে আজকাল এর নাম রোজই খবরে পাওয়া যাচ্ছে। যাঁরা আম আদমি পার্টি করেন তাঁদের ছোট না করেও বলতে হয়, ওঁরা যা চেয়েছিলেন তাই ওঁরা পেয়েছেন। ওঁরা চেয়েছিলেন খবরে আসতে— তা এসেছেন। ওঁরা চান মানুষ ওঁদের নিয়ে ভাবুক, ওঁদের নিয়ে আলোচনা করুক। মানুষও তাই করেছে। তাই গান্ধী টুপি মাথায় দিয়ে বিজেপি দপ্তরে পাথর ছুঁড়তে দপ্তরের বোর্ড ভাঙতে দেখা গেছে। তার জন্য ওঁদের লজ্জা নেই। ওঁদের লজ্জা নেই হিংস্র আন্দোলনে জাতীয় পতাকা নিয়ে যাওয়াতে। এতে জাতীয় পতাকার সম্মান হয় না তা হয়ত ওঁরা ভুলে গিয়েছেন। ওঁরা রোজ যাই করুন না কেন আমাদের সে সম্পর্কে বলার কিছু থাকত না। আজ বলতে হচ্ছে এই জন্যই যে এঁরা আমাদের দেশের রাজনৈতিক পরিবেশকে নষ্ট করে দিচ্ছেন। রাজনীতির নামে অন্যেরা অনেক খারাপ করেছেন বলেই মানুষ ওঁদের পেয়ে আঁকড়ে ধরেছিল। রাজনীতিতে টাকার খেলা নিয়ে ওঁরা চিৎকার করেছিলেন। দুর্নীতি নিয়ে ওঁরা সরব হয়েছিলেন। রাজনীতিতে আয়ারাম-গয়ারামদের বিরুদ্ধে বলেছিলেন। দেশের মানুষের জন্য কাজ করবেন বলেছিলেন। দিল্লী নির্বাচনের আগে ওঁদের উত্থান হওয়ার জন্য ওঁরা দিল্লীতে অর্ধেক দামে বিদ্যুৎ এবং বিনামূল্যে জল দেওয়ার কথা বলেছিলেন। দিল্লী বিধানসভার নির্বাচনে জনগণের সমর্থনে বিজেপি-র বিজয়রথ থামিয়ে দিয়েছিল। পরে কংগ্রেসের সাহায্যে একক বৃহত্তম দল বিজেপি-কে ক্ষমতার বাইরে রাখতে সমর্থ হয়েছিল। এরপর মুখ্যমন্ত্রীর আসন দখল। ভি আই পি কালচার ত্যাগ করার কথা বলার পর ওই পথেই গমন, যা সারা ভারতের মানুষ ওঁদের দেখেছেন। ধিক্কারও দিয়েছেন। মানুষের জন্য কাজ করবেন কথা বলে আইন নিজের হাতে তুলে নিয়েছে। যাদের কাজ আইন তৈরি করা, তারাই রক্ষক ও বিচারক হয়েছে। মিথ্যা মামলায় স্কুলের ছাত্রকেও ফাঁসাতে ওদের মহিলা মন্ত্রীর একটুও বাঁধেনি। গোটা ভারতবর্ষ সব দেখেছে। আস্তে আস্তে মানুষের মোহভঙ্গ হয়েছে। মানুষের যত মোহভঙ্গ হয়েছে ওঁরা ততই হিংস্র হয়েছেন। আর সঙ্গে সঙ্গেই ওঁরা নিজেরাই নিজেদের ৪৯ দিনের সরকারের ইতি টেনেছেন। ওঁরা ভেবেছিলেন কংগ্রেসের মতো বিজেপিও ওদের সমর্থন করতে বাধ্য হবে। বিজেপি ওঁদের ভাঙতে যায়নি। ওঁরা নিজেরাই ভেঙেছেন। ওঁদের এমএলএ মুখ্যমন্ত্রীর কাছে জবাব না পেয়ে মিডিয়ার কাছে মুখ খুলেছে। বলতে গেলে ওদের চরিত্র ফাঁস করে দিয়েছে। তাই ওরাও বিন্নিকে দল থেকে তাড়িয়েছেন। ওঁদের দলের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা ওঁদের সংস্রব ত্যাগ করেছেন। এরপর ওঁদের অভিমুখ শুধু বিজেপি-র দিকে ঘুরেছে।

আম আদমি পার্টির অনেক দোষ ছিল। প্রশ্ন হতে পারে ওদের কি কোনো গুণ ছিল না? নিশ্চয়ই ছিল। সাধারণ মানুষের জন্য আওয়াজ তোলা নিশ্চয়ই ভাল গুণ। দুর্নীতির বিরুদ্ধে আওয়াজ তোলাও ভাল গুণ। ভারতে বিভিন্ন রাজ্যে হয় কংগ্রেস নয় বিজেপি-র সরকার বদলে অন্য দলের দিকে মোড় ঘোরানোও মন্দ নয়। এতে হয়ত ওই দুই দল সতর্ক হবে। তাদের মধ্যে যে দোষ এসেছে তাও পরিত্যাগ করার সুযোগ পাবে। অন্তত সাধারণ মানুষ তাই ভেবেছিল। কিন্তু এটা ঠিক নয় যে কংগ্রেস ও বিজেপি চোর, ওরা সাধু। কংগ্রেস বিজেপি যা বলছে সব ভুল আর ওরা ঠিক। এসব ঠিক নয়। এই কথার প্রতিবাদ করলেই খারাপ। তাই ওদের ক্ষতি করতে হবে। ওদের বাড়া ভাতে ছাই দিতে হবে। গুজরাট মডেল সামনে রেখে বিজেপি নির্বাচনে বাজিমাত করবে এটা চলবে না। তাই কেজরিওয়াল সাহেব চললেন গুজরাট মডেলের ফানুস ফাটাতে। এসবে কোনো দোষ নেই। এসব রাজনীতির অঙ্গ, তাবলে একজন আই আর এস প্রাক্তন আমলা কি করে ভুলে যান নির্বাচনী আচরণ বিধির কথা। নির্বাচনী আচরণ বিধি লঙ্ঘন হলে তো পুলিশ প্রশ্ন করবেই। তা থানায় ডেকে প্রশ্ন করতেই কেজরিওয়াল টুইট করে খবর দিলেন তাকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। ব্যাস, সবাইকে এস এম এস করে চলে গেলেন ১২ অশোকা রোডে। ভাঙচুর করা, ইট পাটকেল ছোঁড়া— এসব হতাশা থেকেই হয়। হতাশায় অনেকে নিজের চুলও ছেঁড়ে। এসব কেজরিওয়ালদের হতাশার লক্ষণ।

এব্যাপারে আমার মনে পড়ছে আমেরিকায় ক্রীতদাস প্রথা উচ্ছেদের নায়ক স্যার আব্রাহাম লিঙ্কনের ডগল্যাস সম্পর্কে বিখ্যাত উক্তি— "He has done a right thing in a wrong way." ডগল্যাস ক্রীতদাস প্রথার উচ্ছেদ চেয়েছিলেন অস্ত্রের মাধ্যমে। স্যার লিঙ্কন চেয়েছিলেন আইন পরিবর্তন করে।

জাগো ভারত - ২০

# উন্নয়নের নামে যে ভোগবাদ চলছে তা ব্রহ্মশক্তিহীন ক্ষাত্রশক্তির বিকাশ

**অমলেশ মিশ্র**

গত সংখ্যায় লিখেছিলাম যে গুরুজী, প্রভুজী অথবা স্বামীজী নামের বৃক্ষগুলি হিন্দুস্থানেই ফলে ফুলে সমৃদ্ধ হওয়ার মাটি পেয়েছেন। ইতিহাস বলছে যে, বালিতে মুখ গুঁজে থাকলে ঝড় ঠেকানো যায় না। ধর্ম রক্ষায় সংকল্পিত অস্ত্রধারী হিন্দু সমাজ না থাকায় লক্ষ লক্ষ, কোটি কোটি মানুষকে স্বদেশ ত্যাগ করে উদ্বাস্তু হতে হয়েছে।

লক্ষ্য করলে নজরে পড়বে যে, হিমালয় পর্বতের এপার এবং ওপারে জন্মলাভ করা ধর্মতত্ত্বগুলির মধ্যে মৌলিক প্রভেদ বিদ্যমান। হিমালয়ের এপারের হিন্দু ধর্ম এবং বৌদ্ধ ও জৈন ধর্ম (এ দুটিকে হিন্দু ধর্মেরই উপধর্ম বলা হয়ে থাকে) নীতিগত ভাবে অহিংস, উদার, পরমতসহিষ্ণু, ধর্ম-অর্থ-কাম-মোক্ষ— চার পুরুষার্থে বিশ্বাসী, চূড়ান্ত গণতান্ত্রিক, বৈচিত্র্যে বিশ্বাসী এবং বৈচিত্র্যের মধ্যে ঐক্য তত্ত্বে আস্থাশীল।

হিমালয়ের ওপারে জন্মলাভ করা রিলিজিয়নগুলির এই বৈশিষ্ট্যগুলি নাই। আমরা ধর্মনিরপেক্ষতার বুলিতে ভুলে যাই, বলি বা করি না কেন, পার্থক্যগুলি খুবই স্বচ্ছ এবং পরিষ্কার, না বুঝতে পারার মতো নয়। সত্য এবং উচিত কথা বললে পাছে লড়াইতে যেতে হয়, পাছে ব্যক্তিগত ক্ষতি হয়, তাই অনেকে বুঝেও প্রকাশ করেন না, গোলে হরিবোল করেন। এই কাপুরুষতায় (যদি একে কাপুরুষতা বলা যায়) ক্ষতি হচ্ছে হিন্দুসমাজ, হিন্দুত্ব এবং হিন্দুর।

ধর্মগুরু ও ধর্মপ্রবক্তাদের মধ্যে অতীন্দ্রিয়বাদ [Mysticism] খুব দেখা যায়। একে অলৌকিকতা বললে একটু সহজ হয়। জেনে রাখা ভাল যে, এই অতীন্দ্রিয়তা— আসুরিক এবং দৈবিক দু'রকমেরই হতে পারে। অতীন্দ্রিয়তা মানেই শুভ বা দৈবিক এমন নয়।

হিন্দু পৌরাণিক গল্প এমন অনেক আছে যে কঠোর সাধনায় অনেক অসুরও অনেক অতীন্দ্রিয় ও অলৌকিক ক্ষমতায় অধিকারী হয়েছিল। তাদের অনেকেই শাস্ত্রজ্ঞানী, অনেকেই অসাধারণ বীর ও সাহসী ছিলেন। কিন্তু তাদের সেই সব অসাধারণ শক্তি ও ক্ষমতা তারা অধর্মের কাজে ব্যবহার করেছেন।

অনেক সাধুবাবা, গুরুজী, প্রভুজী স্বামীজীর নাম শোনা যায় যাঁদের অতীন্দ্রিয়তা আছে বলে শোনা যায়। খৃস্টান এবং ইসলাম সম্প্রদায়ের মধ্যেও এরকম মানুষের খবর আমরা পাই। স্বয়ং যীশু এবং মহম্মদও এই ধরনের ক্ষমতার অধিকারী ছিলেন বলে শাস্ত্রে উল্লিখিত। কিন্তু প্রশ্ন হলো, এই শক্তি আত্মউপলব্ধি বা Self-Realisation-এ ব্যবহৃত হয়েছে অথবা নিজস্ব প্রাধান্য ও প্রতিপত্তি বিস্তারে ব্যয়িত হয়েছে।

অতীন্দ্রিয় ক্ষমতায় অধিকারী হলেই যে তিনি শুভকাজ করবেন, একথা মনে করার কারণ নেই। প্রজাপতি দক্ষ শিবকে অস্বীকার করলেন। হিরণ্যকশিপু, রাবণ স্বয়ং বিষ্ণুকে অস্বীকার করলেন। ক্ষমতার মোহ, আধিপত্যের দেমাক অনেক অতীন্দ্রিয় ক্ষমতার অধিকারীকেই বিপথে নিয়ে গেছে।

অমুক পীর, তমুক সাধুবাবা বা স্বামীজী আমাদের অনেকের কাছেই বিশেষ শ্রদ্ধার পাত্র হয়ে আছেন। কিন্তু সমগ্র জীবজগৎ ও মানব- কল্যাণের ক্ষেত্রে তাদের ভূমিকা ও অবদান বিশেষভাবে বিবেচ্য।

যে ক্ষাত্রশক্তি ব্রহ্মশক্তিকে অস্বীকার করে সে ক্ষাত্রশক্তি হয় অসুর। আর যে ক্ষাত্রশক্তি ব্রহ্মশক্তিকে অনুসরণ করে সে ক্ষাত্রশক্তি হয় সুর। ব্রহ্মশক্তি (আধ্যাত্মিক জ্ঞান-Spiritual Knowledge) সম্পন্ন অনেক মানুষ সংসার সম্পর্কে নিস্পৃহ হয়ে যান। ফলে ব্রহ্মশক্তি বিযুক্ত ক্ষাত্রশক্তি রাজত্ব করে। ভারতবর্ষে বর্তমান সেই পরিস্থিতিই সৃষ্টি হয়েছে। শুধু ভারতেই বা বলি কেন, সারাবিশ্বে উন্নয়নের নামে যে ভোগবাদীতা প্রচলিত হয়েছে— তা হলো ব্রহ্মশক্তি বিযুক্ত ক্ষাত্রশক্তির বিকাশ। ফলে বিজ্ঞানের বিশাল শক্তি ব্যাপক ভাবে ক্ষতিকর কাজে ব্যবহৃত হয়ে চলেছে।

ব্রহ্মশক্তি বিযুক্ত ক্ষাত্রশক্তি সর্বদাই ব্রহ্মশক্তি-যুক্তদের আক্রমণ করে। আক্রমণ ও ধর্মান্তরকরণে আদিষ্ট অতীন্দ্রিয় শক্তির অধিকারীরাও তাই করে চলেছেন— সারা বিশ্ব ব্যাপী তার অসংখ্য উদাহরণ বিদ্যমান।

আসুরিক অতীন্দ্রিয়বাদের দুটি বিশেষ বৈশিষ্ট্য লক্ষণীয়— (১) অতিরিক্ত অহংবাদ— সে এমন একটি শক্তির অধিকারী যা অন্য কারুর নাই এবং সে কারণে সে-ই নিজে ঈশ্বর বা ঈশ্বরের প্রতিনিধি। দুনিয়ার সেরা বিষয়টি একমাত্র সেই জানে এবং অন্যদের একমাত্র তার কাছেই আসতে হবে। (২) প্রথম বৈশিষ্ট্যটির অব্যবহিত ফল হলো দ্বিতীয়টি যে— অন্য সকলেই তার থেকে হীন। একদিকে আত্মঅহংকার, অপরদিকে অন্যদের হীন ও ছোট করা।

আসুরিক অতীন্দ্রিয়বাদ আগ্রাসী সম্প্রদায় সৃষ্টি করে। অপরদিকে দৈবিক অতীন্দ্রিয়বাদ যেহেতু কর্মফল ও পুনর্জন্মে বিশ্বাস করে সেহেতু শান্তিপ্রিয়, সহনশীল, উদার হয় ও অন্যকে মর্যাদা দেয়।

অন্য রকম

# লক্ষ্মীলাভে বৃক্ষরোপণ

**নিজস্ব প্রতিনিধি ॥** গত কয়েক শতাব্দী ধরে রাজস্থানে নারী-পুরুষের মধ্যে একটা বৈষম্যের পরম্পরা চলে আসছে। স্বাধীনতার পর এতগুলো বছর অতিক্রম করলেও নারী ও পুরুষের মধ্যে কোথাও যেন একটা ফাঁক থেকে যাচ্ছে। ভাবতে অবাক লাগে এই বিশ্বায়নের যুগে যেখানে নারীরা পুরুষদের সঙ্গে শিক্ষায়, বিভিন্ন পেশায়, রাজনীতি-সহ বিভিন্ন কাজকর্মে সবদিক থেকে সমানতালে পা মিলিয়ে চলেছে, সেখানে তাদের বাড়িতেও কন্যা সন্তান জন্মালে নিজেদেরকে অসুখী বলে মনে করেন। এমনকী এখনও পর্যন্ত কী গ্রামে কী শহরে, জেনে হোক আর না জেনেই হোক, কন্যাভ্রূণ হত্যার মতো ঘৃণ্য পৈশাচিক কাজ করে চলেছে।

এই বর্বরতার কারণে সব থেকে বেশি কন্যাভ্রূণ হত্যার ফলে নারী ও পুরুষের অনুপাতের পার্থক্যে সবচেয়ে এগিয়ে রাজস্থান। রাজস্থানে নারী ও পুরুষের মধ্যে এই অনুপাত আজ নতুন নয়। সেখানে নারী ও পুরুষের মধ্যে অনুপাত এতোটাই বেশি যে তা সভ্য সমাজের লজ্জায় মাথা নত হয়ে যাওয়ার মতো। কিন্তু বর্তমানে দক্ষিণ রাজস্থানের রাজ্যসমঁদ জেলার পিপলনত্রী গ্রামের মানুষ এই কলঙ্কিত ইতিহাসের কালিমা দূর করতে সবুজ গাছকে হাতিয়ার হিসাবে বেছে নিয়েছে।

প্রতিদিন সংবাদপত্রের পাতা খুললেই আমরা দেখতে পাই কোথাও না কোথাও কন্যাভ্রূণ হত্যা, নারী নির্যাতন, ধর্ষণ এমনকী নারী হত্যার মতো ঘটনা ঘটে চলেছে। পিপলনত্রী গ্রাম নিজেদের উদ্যোগেই মহিলাদের ওপর এই রকম বর্বরতার বিরুদ্ধে প্রতিবাদে সোচ্চার হয়েছে এবং সেইসঙ্গে তাদের সুরক্ষার জন্য বিভিন্ন পদক্ষেপ নিয়েছে যা অভিনন্দন যোগ্য। এই গ্রামের মানুষরা এখন কন্যাসন্তান জন্মানোর সঙ্গে সঙ্গে প্রথমে ১১১টি গাছ লাগায় এবং গাছগুলি রক্ষণাবেক্ষণ করতে থাকে। কন্যাসন্তান হওয়াকে তারা লক্ষ্মীলাভ মনে করে। সেই কন্যা বড় হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে গাছগুলিও বড় হয়। ফল ফুলে সমৃদ্ধ হতে থাকে। বেশ কয়েক বছর ধরে গ্রামের লোকেরা খাস জমিগুলিতে আম, জাম, নিম, আমলকির মতো বিভিন্ন প্রজাতির আড়াই লক্ষ গাছ রোপণ করেছে।

গ্রামের এক পুরানো গ্রাম প্রমুখ শ্যামসুন্দর পেরিওয়াল তাঁর কন্যা কিরণের স্মৃতির উদ্দেশে গ্রামে প্রথম কন্যাসন্তান জন্মালে ১১১টি গাছ লাগানোর প্রথা চালু করেছিলেন। প্রতি বছর ওই গ্রামে কমপক্ষে ষাট জন কন্যাসন্তান জন্মলাভ করে। এইসব কন্যার চল্লিশ শতাংশ পিতা-মাতাই সেই কন্যাকে নিজেদের বলে স্বীকার করতে চায় না। এই মানসিকতা পরিবর্তনের জন্য ইতিমধ্যে গ্রামের মধ্যে একটি কমিটি গঠন করা হয়েছে এবং সেই কমিটির মধ্যে স্কুলের প্রধান শিক্ষক, অঙ্গনওয়াড়ি, গ্রাম-পঞ্চায়েতের সদস্যরা যুক্ত থাকার কারণে যে সমস্ত পরিবার কন্যাসন্তানের অস্বীকার করছে তাদের চিহ্নিত করে বোঝানোর চেষ্টা করা হচ্ছে। গ্রামের লোকেরা বারো হাজার টাকা যোগাড় করে আর দশ হাজার টাকা মেয়ের বাবার কাছ থেকে নিয়ে মোট বাইশ হাজার টাকা সেই কন্যার নামে নতুন ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট খুলে কুড়ি বছরের জন্য স্থায়ী আমানত করে দেওয়ার কাজ করছে। সেই কন্যার পিতা-মাতা-কে একটি চুক্তিপত্রে স্বাক্ষর করিয়ে নেওয়া হয় যে আইন অনুসারে কন্যার বিয়ের বয়স না হলে কোনোমতে বিয়ে দেওয়া যাবে না এবং নিয়মিত স্কুলে পাঠাতে হবে আর তার নামে ১১১টি গাছকে রক্ষণাবেক্ষণ করবেন।

এখন এই গ্রামের গাছের রক্ষা করার বা বেড়া দেওয়ার জন্য ঘৃতকুমারী গাছকে ব্যবহার করা হয়েছে। ফলে স্থানীয় মানুষের জীবিকার কাজে অনেক উপকার হচ্ছে। শুধু তাই নয়, গ্রামের মহিলারা ঘৃতকুমারী পাতা থেকে আচার তৈরি করে বিক্রী করে অর্থ উপার্জন করছে। যার ফলে এই গ্রামের সবদিক থেকে আমূল পরিবর্তন হয়েছে। একদিকে যেমন কন্যাভ্রূণ হত্যার মতো ঘটনা কমেছে শুধু তাই নয়, কন্যাকে নিজেদের বলে স্বীকার করে তাকে পড়াশুনা করিয়ে মানুষ করার কাজে উদ্যোগী হচ্ছে। কন্যাসন্তান হওয়ার জন্য নিজেদের আর অখুশি মনে করছে না। এখন রাজস্থানের এই গ্রাম সমগ্র ভারতের কাছে একটি নজির হিসাবে উঠে এসেছে। বর্তমান এই গ্রাম www.piplantri.com নামে একটি ওয়েবসাইট খুলেছে যার মাধ্যমে হাতের নাগালের মধ্যে সমস্ত কিছু দেখতে পাওয়া যাবে। যা আমাদের কন্যাভ্রূণ হত্যার মতো বর্বরতার বিরুদ্ধে নতুন করে ভারতে শেখাবে।

FOR INTERIORS
THAT EVOKE ADMIRATION

For over two decades, Centuryply has been effortlessly redefining interiors into designer spaces with the most stunning range of products that reflect the very best of style, innovation and functionality.

**CENTURYPLY**
Quality that's a class apart!
Fortifying interiors with innovations like the first flexible ply, a 7 year termite-proof, pay back guarantee and many more…

**CENTURYVENEERS**
Exotic designs in wood!
Beautifying Interiors with an exclusive and wide range of Decorative veneers (only BWR available in India) & Senzura Styles, handpicked from around the world...

**CENTURYLAMINATES**
Style that stands out!
Trendsetting interiors with the widest range of laminates having myriad textures, stunning patterns and exquisite designs…

Also available:
**CENTURYMDF**
**CENTURYPRELAM**

CENTURYPLY®

# সাক্ষাৎকার : চন্দন মিত্র

# মেকি পরিবর্তন নয়, মানুষ আসল পরিবর্তন চাইছে

শ্রী চন্দন মিত্র একাধারে প্রবীণ সাংবাদিক ও রাজনীতিবিদ। ইংরাজি দৈনিক ‘পাইওনিয়ার’-এর মালিক ও সম্পাদক এবং রাজ্যসভার সদস্য। এবারের নির্বাচনে হুগলী লোকসভা কেন্দ্রে যা তাঁর জন্মস্থান ও শৈশবের স্মৃতি বিজড়িত, বিজেপি-র প্রার্থী। এক একান্ত সাক্ষাৎকারে তাঁর জীবনের পথ চলার কাহিনী, সাংবাদিকতা থেকে রাজনীতির জগতে প্রবেশ, সম্প্রতি হুগলী কেন্দ্রে প্রার্থী হওয়া ও নির্বাচিত হলে এই কেন্দ্রের জন্য তিনি কি করতে চান তা সংক্ষেপে জানিয়েছেন।

*হুগলীতে বঙ্কিমচন্দ্রের প্রতিমূর্তিতে মাল্যদান করছেন চন্দন মিত্র।*

**□ আপনি তো বেশ কয়েকবছর রাজনীতিতে আছেন। কিন্তু হুগলী-কেই কেন নিজের নির্বাচনী কেন্দ্র হিসেবে বাছলেন?**

□ দেখুন, হুগলীতে আমার জন্ম। হুগলীতেই আমি ছোটবেলায় পড়াশুনো করেছি। এখানে আমার পৈতৃক বাড়ি। প্রায় ১৫০ বছরের পুরানো। আমার পরিবার এখানে প্রায় কয়েক পুরুষ ধরে আছেন। আমার বাবা এখান থেকেই চাকরি শুরু করেন। মিত্তির পরিবার হুগলীর খুব পরিচিত পরিবার। ব্যক্তিগত ভাবে আমারও এখানকার লোকদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ। তাই ঠিক করলাম— যদি লোকসভায় লড়তেই হয় আর আমার পার্টিও বলল যে লোকসভা নির্বাচনে লড়ো, তখন ঠিক করলাম যে জায়গাটাকে চিনি ছোটবেলা থেকে আর যেটা আমার জন্মস্থান, সেখানে যাওয়াটাই যুক্তিযুক্ত হবে। তাই বললাম, যদি আমাকে লড়াতে চান তাহলে হুগলী থেকে লড়ান আর কোথাও থেকে নয়। আমার প্রস্তাব রাজ্য পার্টি এবং কেন্দ্রীয় নেতৃত্বের খুব ভালো লাগল। সবাই বললেন এটা খুব ভালো কথা। নিজের পুরানো ভিটেমাটিতে ফিরে যাচ্ছ, কাজেই সেটাকে আমরা স্বাগত করছি। এইভাবে আমি হুগলীতে ফেরত চলে এলাম।

**□ শৈশব আপনার অনেকটাই এখানে কেটেছে। সেই শৈশবের স্মৃতি সম্পর্কে কিছু বলুন।**

□ আমি খুবই ছোটবেলায়, মার কাছে শুনেছি প্রায় ২ বছর বয়সে তাঁরা আমাকে নিয়ে এখানে আসেন। আমার দাদু তখন বেঁচে ছিলেন। এই বাড়িটা জমজমাট বাড়ি ছিল। আর এখানকারই স্কুলে আমায় প্রথমবার ভর্তি করা হয়— কনভেন্ট স্কুলে (ব্যান্ডেল চার্চের ঠিক উল্টোদিকে)। তখন ডনবসকো আলাদা ছিল না। এবং তখন থেকে আমি ওখানে (তখন মনে হয় ২ বছরই বয়েস) কেজিতে যাচ্ছি। বছর দুয়েক পরে আমার বাবা বললেন যে, এখানে বিশেষ পড়াশুনো হচ্ছে না, বাবার মনে হচ্ছিল ওই কনভেন্ট স্কুলে অঙ্ক শেখানো হচ্ছে না। হুগলী ব্রাঞ্চ স্কুলে আমার অ্যাডমিশন হলো। আমি ক্লাস টু এবং ক্লাস থ্রি-তে হুগলী ব্রাঞ্চ স্কুলে পড়াশুনো করি। খুব সুন্দর স্মৃতি রয়েছে হুগলীতে, ওখানকার বহু শিক্ষক, বহু ছাত্রের সঙ্গে আমার সম্পর্ক খুব ভালো ছিল। এখনও স্কুল অ্যাসোসিয়েশন থেকে প্রতি বছর আমায় চিঠি লেখে। দেখুন ছোটবেলার স্মৃতি সারাজীবন থাকে। এই গঙ্গায় মনে আছে আমি মাঝেমধ্যে সাঁতার কাটতে যেতাম। সেদিন যখন বাজারে গেলাম আপনারও মনে থাকবে যে, এক মহিলা বললেন, আরে ছোটবেলায় তুমি দৌড়ে বেড়াতে, তোমার মা চেঁচাতো ছাদ থেকে— ‘অত দূরে যাস না’। সুতরাং এখনও সেইরকম লোক রয়েছে। যাঁরা এত বছর পরেও হয়তো টিভিতে দেখেছেন, নাম শুনে তাই চিনতে পারলেন। তা না হলে চার পাঁচ বৎসর-এর ছেলের সঙ্গে আজকের আমাকে চেনা অসম্ভব। একটা আন্তরিকতার সম্পর্ক হুগলীর সঙ্গে ছিল, আছে এবং মনে হয় সময়ের সঙ্গে আরও প্রগাঢ় হবে।

**□ আপনার একটা দীর্ঘ সাংবাদিকতার ইতিহাস আছে। আপনি পাইওনিয়ারের সম্পাদক থেকে মালিক হলেন এবং পাইওনিয়ারটাকে যেভাবে অধিগ্রহণ করলেন সে সম্বন্ধে যদি একটু বলেন।**

□ দেখুন, হুগলী থেকে যাওয়ার পর

## একনজরে হুগলী কেন্দ্র

☐ এই লোকসভা কেন্দ্রের মধ্যে চন্দননগর, চুঁচুড়া, ভদ্রেশ্বর এবং বাঁশবেড়িয়া এই চারটি পুরসভা রয়েছে।

☐ সিঙ্গুর (৪টি পঞ্চায়েত বাদে) চুঁচুড়া-মগরা, পোলবা-দাদপুর, বলাগড়, পাণ্ডুয়া, ধনেখালি, (৫টি পঞ্চায়েত বাদে), চণ্ডীতলা ২ ব্লকের ৩টি পঞ্চায়েত এই আসনের অন্তর্গত।

☐ হুগলী লোকসভার অন্তর্গত সাতটি বিধানসভা হলো : সিঙ্গুর, চন্দননগর, চুঁচুড়া, বলাগড়, পাণ্ডুয়া, সপ্তগ্রাম এবং ধনেখালি।

☐ গত লোকসভা নির্বাচনে বামপ্রার্থী এই কেন্দ্রে ভোট পান ৪২.৩৪ শতাংশ, তৃণমূল ও কংগ্রেস জোট ৪৯.৩৮ শতাংশ, বিজেপি ৩.৪৩ শতাংশ।

☐ গত বিধানসভা নির্বাচনে বামফ্রন্ট ৩৯.৫ শতাংশ, তৃণমূল ও কংগ্রেসজোট ৫৪.৪ শতাংশ, বিজেপি ৩.১ শতাংশ ভোট পেয়েছে।

☐ গত পঞ্চায়েত নির্বাচনে বামফ্রন্ট ৪১.২৩ শতাংশ, তৃণমূল ৪৯.৪৮ শতাংশ, কংগ্রেস ৪.৮২ শতাংশ, বিজেপি ৩.৪৭ শতাংশ ভোট পেয়েছে।

আমার জীবনে বহু পরিবর্তন আসে। এবং তা তোড়ের সঙ্গে আসতে থাকল, কলকাতায় গেলাম, ইকনমিক্স নিয়ে আমি স্নাতক করলাম। কিন্তু বিষয়টা আমার খুব একটা ভালো লাগত না। ভীষণ খটমটে বিষয় লাগত, আমার বরাবরই একটু আবেগ, ইতিহাস এবং জাতীয়তাবাদ ইত্যাদির প্রতি আকর্ষণ ছিল। তারপর নিজে থেকেই ঠিক করলাম যে, ইকনমিক্স নয়, আমি ইতিহাস পড়ব, যদিও ইকোনমিক্স-এ আমি ফার্স্ট ক্লাস পেয়েছিলাম, কিন্তু যখন হিস্ট্রিতে চলে গেলাম, এমএ-তে হিস্ট্রি, দু'বছর পরে আমি দিল্লী বিশ্ববিদ্যালয় থেকে গোল্ড মেডেল নিয়ে ফার্স্টক্লাস ফার্স্ট হলাম। তখন শিক্ষকতা করার জন্যে খুব ঝোঁক ছিল। আর ইতিহাস পড়ে বিশেষ করে তখন চাকরি-বাকরির তো সুযোগ তেমন ছিল না, তাই শিক্ষকতা করাটাই শ্রেয়। তখন আমি দিল্লী বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াতে আরম্ভ করি। তিন বছর পড়িয়েছি। অর্থাৎ এম এ পাশ করেই আমি এম এ পড়াতে শুরু করি। এটা খুব একটা সাধারণত হয় না। এরপর শিক্ষকদের কথাতেই (আমার খুব একটা যাওয়ার ইচ্ছা ছিল না) অক্সফোর্ডে যাওয়া। ১৯৮০ সালে অক্সফোর্ড-এ স্কলারশিপ নিয়ে আমি চলে যাই। অক্সফোর্ড-এ গিয়ে ভারতীয় ইতিহাসের ওপর ডক্টরেটও পেয়ে যাই ১৯৮৪ সালে। কিন্তু আমার মন বসছিল না। বিবিসি-তেও আমি পার্টটাইম কাজ করতাম। বিবিসি-র একজন আমাকে বলেন— তুমি ভারতে গিয়ে সাংবাদিকতার চেষ্টা করো। যিনি বলেছিলেন, তাঁকে আমি খুব শ্রদ্ধা করতাম। ভারতে ফিরে আসার ঠিক আগে আমি এদিকে ওদিকে চেষ্টা করি চাকরির জন্যে। আমি দু-একটা জায়গায় চিঠি লিখি যে, এই আমার অ্যাকাডেমিক রেকর্ড এবং সাংবাদিকতা করতে চাই। একমাত্র স্টেটসম্যান কাগজ আমায় প্রত্যুত্তর দেয়। এবং সি আর ইরানি তখন ছিলেন স্টেটসম্যান-এ। তখন উনি আমাকে চিঠি দিয়ে বলেন, তোমার মতন অ্যাকাডেমি কেরিয়ার আমাদের কাছে চাকরি পাবে। কিন্তু কলকাতার স্টেটসম্যান-এ চাকরি দেওয়া হলো। স্টেটসম্যান কাগজে খুবই সাফল্যের সঙ্গে তিন বছর সাংবাদিকতা করি। ১৯৮৪ সালে ইন্দিরা গান্ধীর হত্যা হলো, তার সঙ্গে দেশে জঘন্য দাঙ্গা হলো। তারপরে নির্বাচন। সেই নির্বাচনে রাজীব গান্ধী একটা প্রভাব ফেললেন। ওই নির্বাচন আমি খুবই ঘনিষ্ঠ ভাবে কভার করি। এরপর টাইমস অফ ইন্ডিয়া থেকে চাকরির অফার এলো। আমি টাইমস অফ ইন্ডিয়ার দিল্লী অফিসে চলে গেলাম। যেতেই ডেকে নিয়ে বললেন, তুমি পাঞ্জাব দেখো। (পাঞ্জাবে তখন অপারেশন সবে হয়েছে)। আমি প্রতি দু-সপ্তাহ অন্তর পাঞ্জাব যেতাম, পুরো সন্ত্রাসবাদী এলাকা অমৃতসর, গুরুদাসপুর, এইসব জায়গাগুলো চষে বেড়িয়েছি বলতে পারেন। আর তার ফলে নাম হলো আমার সাংবাদিক মহলে— যে পাঞ্জাব আমি পুরোপুরি কভার করেছি। এরপর আমি হিন্দুস্থান টাইমস-এর অ্যাসোসিয়েট এডিটর হিসাবে কাজে যোগ দিই। চার বছর হিন্দুস্থান টাইমস-এ ছিলাম। সে সময় পাইওনিয়ার কাগজের তখন মালিক ছিলেন মিস্টার থাপার, উনি আমাকে একদিন ডেকে পাঠালেন, বললেন— আমি একটি সর্বভারতীয় কাগজ তৈরি করতে চাই, তখন নতুন টেকনোলজি সবে আসছে। উনি বললেন, আমি চাই কাগজটাকে সর্বভারতীয় করে তুলতে। তা আমার মনে হলো চ্যালেঞ্জটা নেওয়ার যোগ্য। আমি হিন্দুস্থান টাইমস ছেড়ে পাইওনিয়ার-এ চলে গেলাম। দু-বছরের মধ্যেই ওই থাপার গ্রুপ-এর আর্থিক অবস্থা খুবই খারাপ হয়ে গেল। এবং ব্যাঙ্ক ওদের ওপর খুবই চাপ দিল। আমাকে একদিন ডেকে হঠাৎ বলা হলো যে খুবই দুঃখিত, চন্দন, ওমুক তারিখ থেকে আমরা কাগজটা বন্ধ করছি। জানুয়ারি মাসের কথা— মনে আছে আমার। তা আমি ফিরে এসে অফিসে মিটিং করলাম। সবাই বলল খুবই দুঃখের বিষয়, আমরা আপনার কথা মতো অন্য জায়গার চাকরি ছেড়ে এখানে এসে যোগ দিয়েছিলাম। তা আমারও খারাপ লাগছিল। ৮০০ লোক কাজ করত দিল্লীতে। তার উপর এত লোক আমার উপর বিশ্বাস করে এখানে এসেছিল, তাদের আমি ছেড়ে দিয়ে চলে যাব? তাই শেষ পর্যন্ত আমি একদিন থাপার সাহেবের কাছে গেলাম। হিম্মত করে বললাম, স্যার কাগজটা বন্ধ করবেন না, আমায় দিন।

☐ **তখন আপনার বয়স কত হবে?**

☐ তখন আমার বয়স ৪২-৪৩ বছর। ১৯৯৮ সালের কথা এটা। থাপার সাহেবও মনে হয় না চাইছিলেন যে এটা বাইরের কাউকে বেচতে। একেবারে শেষে যখন সব কিছু হয়ে গেছে, আমি আমার সহকর্মীদের বলেছি হয়ত আমি টেক ওভার করছি। হঠাৎ একদিন আমায় জানানো হলো— হবে না। আমি তখন আদবানিজীর কাছে যাই। আদবানিজীর সঙ্গে আমার অনেকদিনের পরিচয়। এবং প্রায়ই উনি আমায় ডাকতেন। ঘণ্টার পর ঘণ্টা আমাদের মধ্যে এরকম আলোচনা চলত। তখন তিনি স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী, নর্থব্লকে তিনি বসতেন। আমি সকালবেলা ওঁর কাছে পৌঁছলাম। উনি থাপার সাহেবকে ফোন করলেন, তা এরকম কড়াভাবে কথা বলতে শুনিনি কোনোদিন। উনি ফোন করে বললেন, ওনাকে লাল্লি বলে ডাকতেন আদবানীজী। বললেন, লাল্লি, আই ওয়ান্ট টু সলভ দি ম্যাটার বাই ওয়ান ও ক্লক, সলভ ইট অ্যাবাউট। অর্থাৎ ১টার মধ্যে সমাধান করে তুমি আমাকে

জানাও। আই অ্যাম সেনডিং টু চন্দন রাইট নাউ। আমি থাপার সাহেবের কাছে গেলাম। থাপার সাহেব বললেন যে, দেখো, আমি তো তোমাকে দিতে চাই, কিন্তু কোম্পানির বহু লোক তোমায় দিতে আপত্তি করছে। আমি বললাম, দেখুন আদবানীজী তো আপনাকে বলেছেন। যা করবেন করুন, আমি মেনে নেব। ১ লক্ষ টাকায় থাপার সাহেব পাইওনিয়ার ব্র্যান্ডটাকে আমায় দিয়ে দিলেন। তারপর আদবানীজীকে গিয়ে বললাম, স্যার হয়ে গেছে। ১ লাখ টাকা ওঁদের দিয়ে এসেছি। যে এগ্রিমেন্টটা হয়েছিল সেটা নিয়ে অরুণ জেটলির কাছে গেলাম। অরুণভাই দেখে বলল, ঠিক আছে। কিন্তু পাইওনিয়ারটা নিয়ে আমি অন্তত চারদিকে ছড়িয়েছি। আমি নিয়েছিলাম দিল্লী এবং লক্ষ্ণৌ, কিন্তু আজকে দিল্লী, লক্ষ্ণৌ, ভূপাল, ভুবনেশ্বর, রায়পুর, রাঁচী, দেরাদুন ও চণ্ডিগড়— আটটা এডিশন বের হয়। খুব যে সার্কুলেশন বলব তা নয় কিন্তু আমাদের একটা ভিউ পয়েন্ট আছে, একটা মতামত তৈরি করি, আর যারা পাইওনিয়ার পড়ে কাল যদি আমি পত্রিকার দাম ১০ টাকা করে দিই তাহলেও আমি দাবি করে বলতে পারি একটা সার্কুলেশনও পড়বে না। কারণ পাইওনিয়ার-এর যারা রিডার তারা কমিটেড রিডার। তারা কমিটেড এই কারণেই তারা একটা জাতীয়তাবাদী দর্শন, চিন্তাধারা পড়তে চায়। কিন্তু খবরের সঙ্গে নো-কমপ্রোমাইজ, কংগ্রেস কোথাও কিছু ভাল কাজ করছে, সাফল্য হলে সেটা আমরা সাজিয়ে দিই। তাই আমাদের প্রতি কংগ্রেসের কোনো অভিযোগ নেই। তবে হ্যাঁ, ভিউ পয়েন্ট আছে। তোমরা যে বিজেপি-র লোক তা আমরা সবাই জানি, কিন্তু সাংবাদিক হিসেবে তুমি পেশাদার। আমাকে কেউ বলতে পারবে না যে আমি পয়সা নিয়ে খবর করি। কেউ বলতে পারবে না যে অন্যকে আমি সবসময় খাটো করে দেখাই, আমি বলি এডিটোরিয়াল কথাটা। আমি বিজেপি-কে সমর্থন করবো, আমি আর এস এস-কে সমর্থন করি, রামমন্দির আন্দোলন সেটাকে আমি সমর্থন করি। যার ফলে আমি এই পার্টির সঙ্গে জড়িত। কিন্তু যে খবর অন্য কাগজে আছে, সেইসব কাগজের সাংবাদিকরাও আমার সঙ্গে যুক্ত। সবাই আমারা প্রোফেশনাল ভাবেই কাগজ চালাই। নিজেকে আমি এদিক থেকে খুবই পবিত্র মনে করি। এখনও আমি বিজেপি-র এমপি। তাও কাগজ চলছে এবং মোটামুটি সমর্থনও পাই।

□ **শুনেছি আপনি বামপন্থী রাজনীতিতে বিশ্বাসী ছিলেন— তাহলে ?**

□ একটু বামঘেঁষা রাজনীতিতে ছিলাম যদিও পার্টি এর সঙ্গে যুক্ত নয়, দিল্লী ইউনির্ভাসিটি টিচার্স অ্যাসোসিয়েশন-এ একটা বামঘেঁষা গ্রুপ ছিল— আমাদের ইনডিপেন্ডেন্ট লেফট গ্রুপ। তাদের সঙ্গেও আমি জড়িত ছিলাম। ডি ইউ টি এ [Delhi University Teachers Association] আমি সেক্রেটারি ছিলাম। কিন্তু বামের প্রতি যে আকর্ষণ আমার ছোটবেলা থেকে ছিল সেটা ইংল্যান্ড যাওরার পরেই শেষ হয়ে যায়। তখন টিভির পর্দায় পুরোটা দেখলাম যে পোল্যান্ডে কী হচ্ছে; রাশিয়ায় কী হচ্ছে, কীভাবে অত্যাচার হয়েছে। এরা তো হিটলারের চেয়েও খারাপ। সেই বাম থেকে একেবারে সরে এসে, জার্নালিজম শুরু করার পর রাজনীতিতে বীতশ্রদ্ধ হয়ে গিয়েছিলাম। কিন্তু তারপরে যখন ১৯৮৯ সালে রামমন্দির আন্দোলন বিজেপি যেটাকে গ্রহণ করে, তখন এই নিয়ে অনেক লেখালেখি হতে শুরু করে এবং সেগুলো পড়তে আরম্ভ করি, ১৯৯০-এর মধ্যে আমার দৃঢ় বিশ্বাস হয়ে যায় ভগবান রামের জন্মস্থানে একটা মন্দির ছিল। সেই মন্দিরটাকে অনুপ্রবেশকারী বাবর এবং তার সেনারা ভেঙে ওখানে একটা মসজিদে তৈরি করে। এটা অন্যায়। আমার মনে হয় বিজেপি-ই আমাদের ঠিক বলছে হিন্দুদের একটা ভাবনা এটার সঙ্গে যুক্ত আছে, তারপরে একবার বেনারস গিয়ে খুব মন দিয়ে শিবের মন্দিরটা দেখলাম। এবং ওটাতেও দেখি কীভাবে ওখানে একটা মসজিদ তৈরি করা হয়েছে। যেটা হিন্দু ভাবনার সঙ্গে জড়িত, আমাদের পরম্পরার সঙ্গে জড়িত, সেইখানে অপমান করার জন্যে মসজিদ গড়া হচ্ছে বা মন্দির ভেঙে দেওয়া হয়েছে। এইসব দেখতে শুনতে পড়তে আমি প্রায়ই যেতাম অযোধ্যায়। আমি সাধু-সন্তদের সঙ্গে কথা বলতাম। সাধ্বী ঋতম্ভরার সঙ্গে আমার অনেক আলোচনা হোত। এই ভাবে আমার প্রভাবটা বাড়তে থাকল। আর আদবানিজী আমায় প্রায়ই ডেকে পাঠাতেন, ওঁনার খুব চিন্তা ছিল, আমি বরাবরই বলতাম, সবাই চায় যে ওখানে মন্দির হোক। তো উনি আমাকে নিয়ে দু'বার যাত্রা করেছিলেন। যোশীজীর সঙ্গে যাত্রায় অংশ নিয়েছিলাম। আমি ওঁনারই রথে বসে যাত্রা করি। তখন থেকেই নরেন্দ্র মোদীর সঙ্গে আমার পরিচয়। তারপর ওঁনার সঙ্গে খুব ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক হয়ে যায়। অরুণ জেটলি আমার ছেলেবেলার বন্ধু। আর অটলজীকেও আমি বহুদিন ধরে চিনি। কারণ অটলজী দিল্লীতে দিল্লী ইউনির্ভাসিটির এক প্রফেসরের বাড়িতে থাকতেন, যখন জরুরি অবস্থার সময় জেল থেকে তাঁকে স্বাস্থ্যের অবনতির কারণে ছেড়ে দেওয়া হলো, তখন উনি ওই বাড়িতে থাকতেন। প্রতি দু'তিনদিন অন্তরই যেতাম। অটলজী আমাকে খুব স্নেহ করতেন। অটলজীর সঙ্গে রাজনীতির কথা কোনোদিনই খুব একটা হয়নি। কিন্তু একটা ব্যক্তিগত সম্পর্ক হয়েছিল। এই সব মিলে বিজেপি-র যাঁরা শীর্ষ নেতৃত্ব তাঁদের স্নেহভাজন হই এবং তাঁদের আদর্শ ও চিন্তাধারায় প্রভাবিত হই।

□ **আপনি রাজ্যসভার সদস্য কীভাবে হলেন ?**

□ এই সিটটা নিয়ে অনেক মারামারি হয়েছে। টপক্লাস জার্নালিস্টরা চাইছিল। হঠাৎ আমার পিসতুতো ভাইয়ের বিয়েতে লন্ডনে যেতে হয়েছিল। আমি একাই গিয়েছিলাম। তার একটু পরেই আদবানিজীর ফোন। ফোন করে প্রথমেই বললেন, তোমার ক্রিমিনাল রেকর্ড নেই তো? ১৫ মিনিটের মধ্যে তুমি তোমার সিভি(cv)টা ফ্যাক্স করে দাও। তারপর ভাইয়ের কমপিউটার-এ বসে নিজেই টাইপ করে ফ্যাক্স করে দিলাম। তার একটু পরেই উনি ফোন করে বললেন, তো হো গয়া না? জো আপ চাহে থে? আমি বললাম, ম্যায় তো লন্ডন মে হুঁ। নেহি তো ম্যায় তুরন্ত আপকে পাস যাতা। ঠিক হ্যায়, বাপস আইয়ে। আভি তো লন্ডন মে হ্যায়। তো মস্তি করিয়ে। তারপর আমি সুষমাদিকে এসে জিজ্ঞাসা করলাম— তাহলে আমি বিজেপি জয়েন করি অফিসিয়ালি? আমাকে সুষমাজী বললেন, চন্দন, জয়েন করে কী লাভ। তুমি একজন ইন্ডিপেন্ডেন্ট এডিটর। তোমায় সবাই ইন্ডিপেন্ডেন্ট এডিটর হিসাবেই দেখে, তোমাকে টিভি-তে ডাকে। পার্টির সুবিধা তুমি

ইন্ডিপেন্ডেন্ট। কারণ তুমি আমাদের ভিউ পয়েন্টটাই বলো। কিন্তু ফরমালি পার্টি-তে জয়েন করলে তোমার কি সুবিধা? আপনি যা বলবেন। বললেন, এখন থাক, পরে দেখা যাবে। তা ২০০৯-এ এসে পার্টিতে যোগদান করেছি। আর ততদিনে সঙ্ঘের সঙ্গেও আমার যোগ ঘনিষ্ঠ হলো। রামমাধবজীর সঙ্গে ইন্ডিয়া ফাউন্ডেশন গঠন করলাম। ইন্ডিয়া ফাউন্ডেশন করে বিদেশে আমি গেছি। আমেরিকা, চীন, আরও চার-পাঁচটি জায়গা। এই বিচারধারাকে আগলে ধরে এগোচ্ছি। তবে কাগজটা আমি ইন্ডিপেন্ডেন্ট রাখি।

□ **এখানকার মানুষকে কি বলতে চান?**

□ এত বছরের সাংবাদিক হওয়ার ফলে জন্মভূমিতে ফেরত এসে আমি মনে করি যে, এই এলাকায় বা কিঞ্চিতভাবে পুরো পশ্চিমবাংলার মানুষও বিজেপি-র সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত। সাধারণ মানুষের সঙ্গে দেখা করব, তার ফলে মানুষের মধ্যে একটা প্রভাব পড়বে যে বিজেপি-তে কী ধরনের লোক আছে এবং এটা আমি একটা অবদান বলে মনে করি। আমরা বিশ্বাস করি মানুষ যত আমাদের কথা শুনবে ততই আমাদের প্রতি আকৃষ্ট হবে। তো এই কাজটা আমি সীমিত সাধ্যের মধ্যে যতটা করা সম্ভব সেটা আমি করতে এসেছি। আমি হারি কি জিতি সেটা বড় কথা নয়, আমি জানি খুব কঠিন। পুরো পশ্চিমবাংলাই কঠিন, আর বিশেষ করে যেখানে একটা এমএলএ-ও নেই। সেখানে একটা এমপি-র লড়াই তো দুঃসাধ্য। কিন্তু আমি বিশ্বাস করি যে এই আমি থাকছি, পরিশ্রম করছি, ঘুরে বেড়াচ্ছি, লোকজনদের সঙ্গে দেখা করছি, এটা বৃথা যাবে না। সেই জন্য লড়তে এসেছি।

□ **হুগলীর জন্য আপনার কি কি চিন্তা ভাবনা রয়েছে? এর উন্নয়ন কি করে করবেন বলে ভেবেছেন?**

□ ভাল জিনিসই ভেবেছি। আমার খুবই খারাপ লাগে যখন শুনি বস্তা বস্তা আলু রাস্তায় ফেলে দেওয়া হচ্ছে। ট্রাক্টর চেপ্টে দিয়ে বেরিয়ে যায়। কারণ আলু তখন ৫০ পয়সা কিলো। এখানে চাল, ধান, (হুগলী-বর্ধমান মূলত) সবজির মধ্যে আলু, পটল, পেঁয়াজ, শাক— মানে হেন সবজি নেই যেটা এখানে হয় না। তার জায়গায় কৃষকরা কি দাম পায়? আলু এখানে কৃষক রাস্তায় ফেলে দিচ্ছে আর আমরা ৩০ টাকায় দিল্লীতে সেই আলু কিনছি। এই যে অবিচার যেটা আমাদের সিস্টেমের মধ্যে রয়ে গিয়েছে, এইটা আমার মতে শেষ করতেই হবে। কাজেই আরো বেশি কোলস্টোরেজ চাই। আমি দেখেছি মধ্যপ্রদেশে এত ভাল কমপিউটারাইজড মণ্ডি (বাজার) হয়ে গিয়েছে যে কৃষক ওখানে আসে, তারপরে আড়তদারের সঙ্গে দরকষাকষি চলে। মানে বারগেনিং যাকে বলে, সম্মিলিত ভাবে এই দরকষাকষি এবং তার ফলে কৃষক ন্যায্য মূল্য বা তার চেয়েও বেশি পায়। আমি কৃষকের জন্য কাজ করতে চাই। কারণ হুগলীতে কৃষক সব মেহনতী কৃষক। এইটা আমার প্রথম প্রায়োরিটি। দ্বিতীয় প্রায়োরিটি এই যে এতগুলো কারখানা, হয় বন্ধ হয়ে গেছে বা ধুঁকছে। কাল গিয়েছিলাম ভদ্রেশ্বরে। সেখানে গিয়ে বললাম যে আমি ধোঁয়া দেখতে চাই। আমার ছোটবেলায় মনে আছে আমি মিল দেখতে যেতাম, সেখানে সাইরেনের আওয়াজ, আজ ধোঁয়া, আর সব সাইরেনের শ্রাদ্ধ হয়ে গেছে, ধোঁয়াও বেরোচ্ছে না। আমি চাই এগুলো আবার চালু হোক, এর পরে কেন্দ্রীয় সরকারের যদি কিছু করার থাকে, আবার নতুন করে আইন করে পাটের বস্তাই ব্যবহার করা হবে। এ সমস্তগুলো করব যদি এমপি হই। যথেষ্ট পরিমাণ চাপ আমি সরকারের উপর আনবো। ডানলপ কি হবে এখনও বলা যাচ্ছে না। ভিতরে খালি জমি কিছু পড়ে রয়েছে। সেখানে শুনলাম যন্ত্রপাতি মানুষ চুরি করে পালাচ্ছে। সিঙ্গুরের ব্যাপারটাও এক। যে এত ভাল জমি পড়ে রয়েছে। এর ভাল কানেকটিভিটি রয়েছে। এখানে কি কারখানার পুনরুজ্জিবিত করা হবে? না, IT Hub বা IT Park হতে পারে এখানে। হুগলীর ছাত্ররা খুবই মেধাবী। তারা বাইরে গিয়ে অনেক কিছু করছে। এখানে অনেকে কম্পিউটার ব্যবসাও চালু করেছিল। এইগুলো দিয়েই আমার প্রাথমিকতা হবে। মাথায় বন্দুক ঠেকিয়ে কারখানা খোলো— এই ভাবে হয় না। সবাইকে নিয়ে সকলের সহযোগিতা নিয়ে কাজ করতে হবে। লোককে অশিক্ষিত রাখো, অজ্ঞ রাখো, গরীব রাখো এই হচ্ছে সিপিএম আর তৃণমূলের নীতি। আমি বিশ্বাস করি মোদীজীর সরকার দিল্লীতে এলে আমরা এই নীতি পাল্টাতে পারব।

□ **শেষ প্রশ্ন। আপনি প্রচারে কেমন সাড়া পাচ্ছেন? তৃণমূল বা সিপিএম থেকে যাঁরা দাঁড়িয়েছেন তাদেরকে প্রতিযোগী হিসাবে কিরকম দেখছেন?**

□ দেখুন, পশ্চিমবঙ্গে একটা সমস্যা আছে। মানুষ পশ্চিমবঙ্গে বেশি করে পলিটিকালি কমিটেড হয়ে যায়। অবশ্য না ভেবে কমিটেড হতে নেই। কমিটেড হয়ে পরে পস্তাতে হয়। ৩৪ বৎসর সিপিএম পিষে রেখে দিল পশ্চিমবঙ্গের মানুষকে। তারপরে এল টিএমসি। এসে এই আড়াই বছরে তার চেয়েও বেশি করছে। গুণ্ডামি, নারী নির্যাতন, তা সিপিএম-এর চেয়েও খারাপ। আমি আশা করব এই নির্বাচনে বিজেপিকে মানুষ বিকল্প হিসাবে দেখবে। এবং এই গত কয়েকদিনে আমি যা প্রচার করেছি এতে একটা জিনিস স্পষ্ট লোকের চোখে মুখে আমি দেখতে পাচ্ছি। লোকে চাইছে মেকি পরিবর্তন নয়, আসল পরিবর্তন। ৩৪ বছরের পাথর সরিয়ে নিচে থেকে বেরোলো সাপ। তো এখন মানুষ জাগছে। এখন আমরা যদি পাথর দিয়ে সাপটাকে মেরে ফেলতে পারি তাহলে মানুষ স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলবে। আর সেই কাজটা আমাদের করতে হবে। আমাদের বিশ্বাসযোগ্যতা প্রমাণ করতে হবে। আমরা যদি খাটি, বিশ্বাস করুন এই সিট আমি জিতে একটা রাজনৈতিক অঘটন করিয়ে ছাড়ব।

□ **আপনি যে প্রচারটা করছেন তাতে সাড়া পাচ্ছেন?**

□ খুব সাড়া পাচ্ছি। কিন্তু এখনও বক্তব্য রাখছি না। এখন শুধু পরিচয় করছি। যে আমি রাজ্যসভার সদস্য, আমি পার্লামেন্টের আইন-কানুন রীতি রেওয়াজ জানি, আমি ৩০ বৎসরের সাংবাদিক। তো আমার একটা অভিজ্ঞতা আছে। তো আপনারা আমাকে বিশ্বাস করতে পারেন। আমি সেই বিশ্বাসযোগ্য ব্যক্তি। আমি আমার পার্টির যে নীতি আর কল্পনা তা লোকের কাছে নিয়ে যাব। আমি মনে করি তত দিনে আমার বিশ্বাসযোগ্যতা আরও কিছুটা বাড়বে। তাইতে আমাদের আরও কিছু সুবিধা হবে। মানুষের কাছে বক্তব্যটা রাখতে এবং মানুষকে বিশ্বাসযোগ্য করে তুলতে।

# দেশের নিরাপত্তার কথা ভেবেই ভোটে দাঁড়িয়েছেন এসএসবির প্রাক্তন ডিআইজি সত্যলাল সরকার

***নির্বাচনের দিন যত এগিয়ে আসছে সমগ্র দেশের সঙ্গে উত্তরবঙ্গেও মোদী হাওয়া প্রবল আকার ধারণ করছে। উত্তরবঙ্গের প্রথম তিনটি লোকসভা আসনের ভোটারদের সঙ্গে সরাসরি কথা বলে এই তিনটি সংরক্ষিত আসনে ২০১৪-এর আসন্ন লোকসভা ভোটে সম্ভাব্য ফলাফল বিশ্লেষণ করেছেন স্বস্তিকার প্রতিনিধি সাধন কুমার পাল।***

মেখলিগঞ্জ, ধুপগুড়ি, ময়নাগুড়ি, জলপাইগুড়ি, রাজগঞ্জ-সহ মোট পাঁচটি এসসি বিধানসভা আসন, মাল (এসটি) ও ডাবগ্রাম ফুলবাড়ি অসংরক্ষিত বিধানসভা আসন নিয়ে পশ্চিমবঙ্গের ৩নং লোকসভা আসন জলপাইগুড়ি (এসসি) লোকসভা গঠিত হয়েছে। ২০০৯-এর লোকসভা নির্বাচনের জয়ী প্রার্থী বামফ্রন্টের সিপিএম প্রার্থী মহেন্দ্র কুমার রায় পেয়েছিলেন ৪৫.৫৪ শতাংশ, দ্বিতীয় স্থানে থাকা কংগ্রেস- তৃণমূল কংগ্রেস জোট প্রার্থী কংগ্রেসের সুখবিলাস বর্মা পেয়েছিলেন ৩৬.৯৭ শতাংশ ভোট ও তৃতীয় স্থানে থাকা বিজেপি প্রার্থী দীপেন্দ্রনাথ প্রামাণিক একক শক্তিতে লড়ে পেয়েছিলেন ৯.১৫ শতাংশ ভোট। এবার বামফ্রন্ট ক্ষমতায় নেই। জলপাইগুড়ি জেলাপরিষদে এখনো সিপিএম ক্ষমতায়। মেখলিগঞ্জের বিধানসভার মতো ফরওয়ার্ড ব্লকের শক্ত ঘাটিতে ধস নেমেছে। মেখলিগঞ্জপুর সভার মতো, অনেক গ্রাম পঞ্চায়েত ফরওয়ার্ড ব্লকের আনুগত্য থেকে বেরিয়ে তৃণমূলে যোগ দিয়েছে। বলার অপেক্ষা রাখে না বাম আনুগত্য থেকে বেরিয়ে আসার প্রবণতা স্পষ্ট হয়ে উঠেছে জলপাইগুড়ি লোকসভা কেন্দ্রের ভোটারদের মধ্যে।

এদিকে কংগ্রেস তৃণমূল জোট ভেঙ্গে যাওয়াতে উভয় দলই পৃথক পৃথক প্রার্থী দিয়েছে। রাজ্যে আড়াই বছরের তৃণমূল শাসনে বর্তমান সরকার ও দল সম্পর্কে মানুষের মধ্যে হতাশা দেখা দিয়েছে। তাছাড়া গোষ্ঠীদ্বন্দ্বে জর্জরিত তৃণমূল কংগ্রেসের কর্মীদের মধ্যে নির্বাচনে জেতার মতো আত্মবিশ্বাসী চেহারাও ধরা পরছে না। এই পরিস্থিতিতে ২০১৪ নির্বাচনে-কে জয়ী হবে এটা হলফ করে কেউ বলতে পারছে না।

এই পরিস্থিতিতে তৃতীয় স্থানে থাকা বিজেপি বোধহয় অনেকটাই সুবিধাজনক স্থানে আছে। কারণ গোর্খাজনমুক্তি মোর্চা ও কেপিপি-র প্রকাশ্য সমর্থন ছাড়াও যোগগুরু রামদেবের সংগঠনের মতো বেশকিছু ধর্মীয় ও সামাজিক সংগঠন সমগ্র ভারতের মতো জলপাইগুড়ি কেন্দ্রেও নরেন্দ্র মোদীর সমর্থনে বিজেপি প্রার্থীর জন্য ডোর-টু-ডোর জনসংযোগ করছে। রাজ্যে রাজনৈতিক পরিবর্তনের পর মমতার আড়াই বছরের শাসনে রাজ্যবাসী হতাশ। এই হতাশা এক সময়ের কমিটেট ভোটার হিসেবে পরিচিত বামেদের প্রতি আস্থা হারানো পশ্চিমবঙ্গের বহুসংখ্যক ভোটারকে তৃণমূলের কমিটেট ভোটারে পরিণত হতে দেয়নি। এই বিপুল সংখ্যক ভোটার ফ্লোটিং ভোটারের দলে মিশে গেছে। ফলে এরাজ্যে বেড়েছে ফ্লোটিং ভোটারের সংখ্যা। এবারের মোদী হাওয়ার জেরে এই বিপুল সংখ্যক ফ্লোটিং ভোট বিজেপি প্রার্থীদের পক্ষেই যাবে এমনটাই মনে করছেন বিশ্লেষকরা। শুধু জলপাইগুড়ি কেন্দ্র নয় এই প্রবণতা গোটা পশ্চিমবঙ্গ জুড়ে। এই ফ্লোটিং ভোটারদের জন্যই এরাজ্যে এবার লোকসভা ভোটের পূর্বাভাস দেওয়া কঠিন। এসএসবি-র অবসর প্রাপ্ত ডিআইজি জলপাইগুড়ি কেন্দ্রের বিজেপি প্রার্থী সত্যলাল সরকার কর্ম জীবনে প্রত্যক্ষভাবে অনুভব করেছেন। আমাদের দেশে নিরাপত্তার কাজে তুলনায় বিশ্বের শ্রেষ্ঠ জোয়ানরা যুক্ত থাকলেও শুধু মাত্র ক্ষমতালিপ্সু কংগ্রেস দলের ভ্রান্ত সুরক্ষা নীতির জন্যই আজ দেশের নিরাপত্তা ব্যবস্থা ভেঙ্গে পড়েছে। মরছে অসহায় আমজনতা সেই সঙ্গে শহীদ হচ্ছে বাহাদুর সেনা জওয়ানরা। দেশের নিরাপত্তা ব্যবস্থা মজবুত করার তাগিদে শ্রী সরকারের বিজেপি-তে আগমন ও ভোটে দাঁড়ানো। ভুটান পাহাড়ের ডলোমাইট কাঁচামাল হিসেবে ব্যবহার করে বাংলাদেশ সিমেন্ট কারখানা গড়েছে। নির্বাচিত হলে জলপাইগুড়িতে সিমেন্ট কারখানা গড়বেন, তিস্তার দ্বিতীয় সেতু গড়বেন, বাংলাদেশের মধ্য দিয়ে তেঁতুলিয়া করিডরের দাবিতে কেন্দ্রর দ্বারস্থ হবেন, স্থানীয় কাঁচা মাল দিয়ে কাগজ শিল্প গড়ে তুলবেন। ভোটারদের সামনে দেশের নিরাপত্তার প্রতিশ্রুতি ছাড়াও এরকম ব্যতিক্রমী প্রতিশ্রুতি বিলোচ্ছেন শ্রী সরকার। প্রশ্ন করাতে এই পোড় খাওয়া বিজেপি প্রার্থী অনেকটাই নিশ্চিন্ত ভঙ্গিতে জানালেন জয়ের ব্যাপারে তিনি ১০০ শতাংশ নিশ্চিত।

ভোট-কথা

# নরেন্দ্র মোদীকে উপহার দিতে কোচবিহার কেন্দ্র থেকে জিততে আশাবাদী হেমচন্দ্র বর্মন

শুধু ভারত নয় সমস্ত পৃথিবীর মধ্যে কোচবিহারই একমাত্র জেলা যেখানে রেকর্ড সংখ্যক ছিটমহল রয়েছে। মানুষের বসবাসের জন্য বিশ্বের বিস্ময় এই ছিটগুলি নরকের চেয়েও ভয়ঙ্কর। আমি নির্বাচিত হলে ভারতের স্বার্থ বজায় রেখে কংগ্রেসি ভুলের ফসল এই ছিট সমস্যার সমাধান করার জন্য যতদূর যেতে হয় যাব। কোচবিহারের ঐতিহ্য মহারাজা জগদীপেন্দ্রনারায়ণ সংস্কৃত কলেজ পুনরায় চালু করা, চুরি হতে থাকা রাজ আমলের অস্ত্রশস্ত্র সংরক্ষণের জন্য কোচবিহার রাজপ্রাসাদে আর্মস গ্যালারি ও ঐতিহ্য সম্পন্ন প্রাচীন মুদ্রাদি সংরক্ষণের জন্য কয়েন গ্যালারি স্থাপন, কর্মসংস্থানের লক্ষ্যে পিছিয়ে পরা প্রান্তিক জেলা হিসেবে কোচবিহারকে ট্যাক্স ফ্রি জোন হিসেবে ঘোষণা করিয়ে যাতে এই জেলাকে শিল্পের গন্তব্যস্থল হিসেবে গড়ে তোলা যায় তার জন্য জান লড়িয়ে দেব।

হ্যাঁ, ঠিক এই ভাষাতেই ভোটারদের কাছে টানার চেষ্টা করছেন কোচবিহার (তপঃ) কেন্দ্রের বিজেপি প্রার্থী হেমচন্দ্র বর্মন। দীর্ঘ সময় বিজেপি-র জেলা সভাপতির গুরুদায়িত্ব পালন করা আসা (২০০৩- ২০০৬, ২০০৯-১৪) হেমচন্দ্র বর্মন নির্বাচনী ময়দানে মোটেই আনাড়ি নন। ২০০১ ও ২০০৬ বিধানসভা নির্বাচনে পশ্চিমবঙ্গের ভিয়েতনাম বলে পরিচিত যথাক্রমে শীতলকুচি ও মাথাভাঙ্গা বিধানসভা আসনে লড়াই করে সমীহ করার মতো ভোট পেয়েছেন।

২০১৪-এর লোকসভা ভোটে কংগ্রেস ও বামফ্রন্টের প্রার্থীর জেতার সম্ভাবনা আছে এমন আলোচনা কোচবিহার লোকসভা কেন্দ্রের সচেতন বাসিন্দা হিসেবে কোথাও শুনিনি। লোকসভা টিকিট পাওয়ার পরই তৃণমূল কংগ্রেসের প্রার্থী অচেনা মুখ রেণুকা সিনহা তৃণমূল কংগ্রেসের সদস্যা হয়েছেন এমনটাই বলছেন দলের ওই লোকেরা। শ্রীমতী সিনহা তৃণমূল কংগ্রেসে আরেক নবাগত কোচবিহার পুরসভার চেয়ারম্যান বীরেন (ভুটু) কুণ্ডুর লবীর প্রার্থী বলে পরিচিত। রেণুকা নির্বাচিত হয়ে গেলে দলে বর্তমান জেলা নেতৃত্ব কোণঠাসা হয়ে দলের ক্ষমতার রাশ সদ্য কংগ্রেস ছেড়ে আসা ভুটু কুণ্ডুর হাতে চলে যাবে এমন আশঙ্কায় থাকছেই। দলের একটি অংশ ইতিমধ্যেই রটাতে শুরু করেছে শ্রীমতি সিনহা নাকি জন্মসূত্রে রাজবংশী নন। মমতা যতই বলুক না কেন, উপর উপর দৌড় ঝাঁপ করলেও এমন একজন প্রার্থীকে জেতানোর জন্য তৃণমূল কংগ্রেস কর্মীরা মন থেকে কতটা ঝাঁপাবেন সেই সন্দেহ কিন্তু থেকেই যায়।

এরকম একটি প্রেক্ষাপটে এবার জেতার সম্ভাবনা কতটা প্রশ্ন করাতে আত্মবিশ্বাস সহকারে উত্তরবঙ্গের মোদী ব্রিগেডের প্রবীণ প্রার্থী হেমেনবাবু জানালেন, মমতা ঝড় থেমে গিয়ে তৃণমূলের গোষ্ঠীদ্বন্দ্বের ঝড়ে এই বাংলার মাটিতে জোড়া ফুল এখন ঝরে যাচ্ছে। পাশাপাশি মোদী ঝড়ের দাপটে সুবাস ছড়িয়ে ফুটছে পদ্ম। আমার স্থির বিশ্বাস কোচবিহারের মানুষ এবার নরেন্দ্র মোদীকে কোচবিহার কেন্দ্রটি উপহার দেবেই। হেমেনবাবুর দাবির দম বুঝতে ১৬ মে পর্যন্ত অপেক্ষা করা ছাড়া আমাদের উপায় নেই।

---

জাতীয়তাবাদী বাংলা
সংবাদ সাপ্তাহিক
স্বস্তিকা
পড়ুন ও পড়ান
বার্ষিক গ্রাহকমূল্য ৪০০ টাকা

# আলিপুরদুয়ারকে ভারতের পরিবর্তনের মিছিলে সামিল করতে মরিয়া বীরেন্দ্র বোরা ওরাওঁ

আলিপুর দুয়ার (এসটি) পশ্চিমবঙ্গের ২ নম্বর লোকসভা আসন। ৯-তুফানগঞ্জ, ১০-কুমার গ্রাম (এসটি), ১১-কালচিনি (এসটি), ১২-আলিপুরদুয়ার, ১৩-ফালাকাটা (এসসি), ১৪-মাদারিহাট (এসটি), ২১-নাগরাকাটা (এসটি)— এই সাতটি বিধান সভা কেন্দ্র নিয়ে গঠিত আলিপুরদুয়ার (এসটি) লোকসভা কেন্দ্র। ২০০৯-এর লোকসভা ভোটে এই কেন্দ্রে বিজেপি প্রার্থী মনোজ টিগ্গা ১৯৯৮৪৩টি ভোট অর্থাৎ ২১.৪০ শতাংশ ভোট পেয়ে তৃতীয় স্থানে ছিল। বিজয়ী প্রার্থী আরএসপি-র মনোহর তিরকে ও দ্বিতীয় স্থানে থাকা তৃণমূল কংগ্রেসের পবন কুমার লাকড়া পেয়েছিল যথাক্রমে ৪১.২২ শতাংশ এবং ২৯.১৪ শতাংশ ভোট। ওই নির্বাচনে আরএসপি ভোট লড়েছিল ক্ষমতাসীন দল হিসেবে। আর তৃণমূল কংগ্রেস ও কংগ্রেস জোট বেঁধে লড়াই করেছিল। বামফ্রন্ট ক্ষমতাচ্যুত হওয়াতে এবার ভোটে আরএসপি-র ভোট কমবে এটাই স্বাভাবিক। জোট না হওয়াতে কংগ্রেস আলাদা প্রার্থী দিয়েছে এই কেন্দ্রে।

রাজ্যে ক্ষমতায় থাকলেও এবার একা লড়ার ফলে ভোট কমবে তৃণমূল কংগ্রেসেরও এমনটাই মনে করছে রাজনৈতিক বিশ্লেষকরা। গত বিধানসভা নির্বাচনের সময় আরএসপি ছেড়ে আসা দশরথ তিরকে এবার তৃণমূল কংগ্রেস প্রার্থী। সেক্ষেত্রে ভোট কাটাকাটি হয়ে আরএসপি-র কিছু ভোট তৃণমূল কংগ্রেসের ঝুলিতে যাওয়ার সম্ভাবনাও রয়েছে। অর্থাৎ প্রথম ও দ্বিতীয় স্থানে থাকা দু'টি দলেরই ভোট কমার যুক্তি সংগত কারণ রয়েছে। এবার ২০০৯-এর লোকসভা নির্বাচনে তৃতীয় স্থানে থাকা বিজেপি-র ভোট বাড়ার যথেষ্ট যুক্তি সংগত কারণ রয়েছে। কারণ গত লোকসভা নির্বাচনে বিজেপি-কে সমর্থনকারী দল হিসেবে গোর্খা জনমুক্তি মোর্চা এবারও বিজেপি-র সঙ্গেই রয়েছে। এছাড়া এবার ডুয়ার্সে আদিবাসি বিকাশ পরিষদের সবচেয়ে প্রভাবশালী জনবার্লা গোষ্ঠী অর্থাৎ ঝাড়খন্ড মুক্তি মোর্চা, প্রোগ্রেসিভ পিপলস্ পার্টি, কামতাপুর পিপলস পার্টির মতো তিনটি দল বিজেপি প্রার্থী-কে সমর্থন করছে।

এই কেন্দ্রে এবারের বিজেপি প্রার্থী হাসিমারা হিন্দি হাইস্কুলের শিক্ষক ৩২ বছর বয়সের বীরেন্দ্র বোরা ওরাওঁ আরএসপি ও তৃণমূল কংগ্রেসেরও পঞ্চাশের কোটা পেরিয়ে যাওয়া প্রার্থীদের তুলনায় অনেকটাই তরুণ, ঝকঝকে, স্মার্ট ও দুর্নীতির দাগ মুক্ত প্রার্থী। রাজ্যে 'গরিবের' সরকার পরিবর্তন হয়ে মা মাটি মানুষের সরকার এসেছে। কেন্দ্রের ইউপিএ সরকার জনকল্যাণের বড় বড় ফিরিস্তি দিচ্ছে, তবুও কেন বন্ধ চা বাগানগুলিতে অনাহারে মৃত্যুর মিছিল থামছে না? কেনই বা চা বাগানগুলি বন্ধ হয়ে পরে আছে? নেপালি ভাষী, হিন্দি ভাষী বহু মানুষের বাস সত্ত্বেও কেনই বা ডুয়ার্সে নেপালি মাধ্যম, হিন্দি মাধ্যম কলেজ নেই? স্বাধীনতার ছয় দশক পেরিয়ে গেলেও আজ পর্যন্ত ডুয়ার্সে কেন পানীয় জলসঙ্কট দুর করা গেল না? ডুয়ার্সের রেলপথ কেন হাতীর মতো বন্য প্রাণীর বধ্যভূমি হিসেবে পরিচিত? ডুয়ার্সের জীবন যন্ত্রণা সম্পর্কিত এরকম হাজারো প্রশ্ন তুলে বিজেপি-র বীরেন্দ্র যেমন আরএসপি, তৃণমূল কংগ্রেস ও কংগ্রেস প্রার্থীদের ভোটারদের থেকে বিচ্ছিন্ন করার প্রয়াস চালাচ্ছেন, তেমনি নির্বাচিত হলে এই সমস্ত সমস্যা সমাধানের জন্য জান লড়িয়ে দেবেন এমন প্রতিশ্রুতি দিয়ে ভোটারদের মন জয়ের চেষ্টা চালাচ্ছেন। সঙ্গে সঙ্গে ভোটারদের এই বলেও সতর্ক করছেন যে আরএসপি, তৃণমূল কংগ্রেস জেতার মরিয়া প্রয়াস হিসেবে রিগিং, ছাপ্পা ভোটের আশ্রয় নিতে পারে। সেসব অগ্রাহ্য করে ভোট দিন। 'আমার মাধ্যমে নরেন্দ্র মোদীকে জয় যুক্ত করুন।'

ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘের
মুখপত্র
**প্রণব**
পড়ুন ও পড়অন

# সফল অভিনেতা নিমু ভৌমিক রাজনৈতিক মঞ্চেও সাফল্য লাভে আত্মবিশ্বাসী

রায়গঞ্জে এবার ভারতীয় জনতা পার্টি বাংলা চলচ্চিত্র জগতের বহু-পরিচিত অভিনেতা নিমু ভৌমিককে লোকসভা নির্বাচনে প্রার্থী করেছে। নিমুবাবু দেশে-বিদেশেও (পরিচয়পত্র এবং পাসপোর্টেও) নিমু ভৌমিক নামেই পরিচিত। সাবেক পূর্ববঙ্গের দিনাজপুর জেলার কাশীতলা গ্রামে তাঁর জন্ম। কিশোর অবস্থাটা ওখানেই কাটিয়ে পরে কলকাতায় পড়াশোনা ও অভিনয় জীবনে পদার্পণ। ১৯৪৭-এ এপারে চলে এসেছেন। গত ১৬ মার্চ রাত দশটা নাগাদ রায়গঞ্জের বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ এবং গতবারের প্রার্থী ড. গোপেশ সরকারের বাড়িতে একান্ত সাক্ষাৎকারে অনেক কথাই বললেন নিপাট ভদ্রলোক নিমুবাবু।

▯ **অভিনয় থেকে রাজনীতিতে এলেন কেন?**

▯ আমার 'মা' ১০৬ বছর বেঁচেছিলেন। তিনি তাঁর জীবনে অনেক সমাজসেবার কাজ করেছেন। মায়ের আদর্শ ও মাতৃভূমির সেবার টানেই রাজনীতিতে আসা। আমার 'মা' ল্যায়ন্স ক্লাব, সেন্টজন অ্যাম্বুলেন্স, রামকৃষ্ণ মিশন ও ভারত সেবাশ্রমে সঙ্ঘের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। অনেক দান-ধ্যান করেছেন। কংগ্রেসের জেলা পরিষদের সদস্যা ছিলেন। মেয়েদের জন্য মহিলা সমিতি করে কাজ করেছেন, তিনটি স্কুল প্রতিষ্ঠা করেছেন। যা এখনও চলছে। মায়ের স্মৃতিতে দেশমাতৃকার জন্য প্রেরণা পেয়েই রাজনীতিতে আসা।

▯ **রাজনীতিতে এলেন— কিন্তু বিজেপি কেন?**

▯ এক্ষেত্রে বিজেপি-র প্রধানমন্ত্রী পদপ্রার্থী নরেন্দ্র মোদীর কথাবার্তা ও উন্নয়নের বার্তাই আমাকে বিজেপিতে যোগ দিতে উৎসাহিত করেছে। মোদীজী সব রাজ্যকে সমানভাবে দেখবেন বলছেন। এই উদারতায় আমি অভিভূত। মোদীজীর উপর সম্পূর্ণ বিশ্বাস আছে। ড. শ্যামাপ্রসাদকে দেখেছি। বাজপেয়ীজীও ৬ বছর কেন্দ্রে সরকার চালিয়েছেন। তারপর আবার কংগ্রেস-ইউপিএ দশ বছর। এই দশবছরে যা হয়েছে তারপর আমার আর কংগ্রেসে আস্থা রইল না। গত দশ বছরে বিশেষ কিছু হয়নি। আমি খুব আশাহত। একসময় রায়গঞ্জ খেলাধুলা, সংস্কৃতিতে উল্লেখযোগ্য ছিল। আগের মতো রায়গঞ্জের ছেলেরা আর কলকাতার ফার্স্ট ডিভিশনে যাচ্ছে না। একটা-আধটা ব্যতিক্রম হতে পারে।

▯ **এই পশ্চাদ্গামিতা বা অধঃপতনের জন্য কাদের দায়ী করছেন?**

▯ যারা ৩৪ বছর সরকার চালিয়েছে তারাই দায়ী।

▯ **কেন? ২০১১-তে তো পরিবর্তন হয়েছে।**

▯ পরিবর্তনের পরও কাম্য পরিবর্তন হয়নি।

▯ **জেতার ব্যাপারে কতটা আত্মবিশ্বাসী?**

▯ হ্যাঁ, বিশ্বাস আছে। (পাশ থেকে সর্বক্ষণের সঙ্গী ভাইপো বললেন--- ছোটকাকুকে জেতাতেই হবে। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, চারভাইয়ের মধ্যে নিমুবাবু ছোট।)

▯ **জিতলে অগ্রাধিকার...**

▯ রায়গঞ্জে উন্নয়ন ও এইমস্ (All India Institute of Medical Science) প্রতিষ্ঠাকে প্রাধান্য দেব। রায়গঞ্জের এককালের সংস্কৃতিকে আবার ফিরিয়ে আনব। সাংস্কৃতিক শহরের পরিচয়ে ভূষিত হবে রায়গঞ্জ। রায়গঞ্জে বাড়ি। সবসময়ই যোগাযোগ রয়েছে। রয়েছে একরকম নাড়ির টান।

▯ **আপনি সিনেমা থিয়েটার ও যাত্রা জগতে স্বনামধন্য প্রতিষ্ঠিত অভিনেতা। সেরকম স্বীকৃতি পাননি বলে কোনও ক্ষোভ বা আক্ষেপ?**

▯ আমি অত্যন্ত ক্ষোভের সঙ্গে বলছি— গত ৩৪ বছরের সরকারও স্বীকৃতি দেয়নি আর বর্তমান রাজ্য সরকারও দেয়নি। অথচ আমার থেকে অনেক নিকৃষ্ট মানের শিল্পীকে অর্থ-সম্মানে ভূষিত করা হচ্ছে। হতে পারে— আমি কখনও রাজনীতিতে সক্রিয় ছিলাম না।

**সংযোজন**

সাক্ষাৎকারের জন্য অনেক ধন্যবাদ। আপনাকে চিত্র ও থিয়েটারে দেখেছি। নিমুবাবু পালটা ধন্যবাদ দিলেন। 'কি বিভ্রাট' থিয়েটার দেখেছি বলাতে খুবই আনন্দিত হলেন। উচ্ছ্বাস প্রকাশ করে থিয়েটারের ডায়লগ বলে গেলেন।

দীর্ঘদিনের সফল অভিনেতাকে এত কাছ থেকে দেখে ও কথাবার্তা বলে মনে হলো উনি অভিনয়ে দক্ষ, তবে বর্তমান রাজনৈতিক নেতাদের মতো অভিনয় জানেন না। এটাই ওঁর প্লাস পয়েন্ট। বাকিটা ভবিষ্যৎই বলবে।

Swastika RNI No. 5257/57 Postal Registration No. Kol. RMS/48/2013-2015
7 April - 2014

নতুন বছর আসুক
নতুন আলো
নতুন ভাবনা
নতুন আশা নিয়ে..
সত্যলাল সরকার
বিজেপি প্রার্থী
জলপাইগুড়ি লোকসভা কেন্দ্র

শুভ বাংলা নববর্ষের
শুভেচ্ছা গ্রহন করুন—
হেমচন্দ্র বর্মন
বিজেপি প্রার্থী
কোচবিহার লোকসভা কেন্দ্র

দাম : ১০.০০ টাকা